হিন্দুধর্ম শিক্ষা

অষ্টম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

হিন্দুধর্ম শিক্ষা

অষ্টম শ্রেণি

২০২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা
প্রফেসর নিরঞ্জন অধিকারী
প্রফেসর ড. পরেশ চন্দ্র মণ্ডল
প্রফেসর ড. দুলাল কান্তি ভৌমিক
বিষ্ণু দাশ
ড. ধীরেন্দ্রনাথ তরফদার
ড. শিশির মল্লিক
শিখা দাস

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১২
পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৪
পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর, ২০২৪
পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর, ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গকথা

বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপযোগ বহুমাত্রিক। শুধু জ্ঞান পরিবেশন নয়, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে সমৃদ্ধ জাতিগঠন এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। একই সাথে মানবিক ও বিজ্ঞানমনস্ক সমাজগঠন নিশ্চিত করার প্রধান অবলম্বনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে আমাদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেম, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শক্তিতে উজ্জীবিত করে তোলাও জরুরি।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাণ শিক্ষাক্রম। শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো পাঠ্যবই। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে গৃহীত হয়েছে একটি লক্ষ্যাভিসারী শিক্ষাক্রম। এর আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণের কাজটি নিষ্ঠার সাথে করে যাচ্ছে। সময়ের চাহিদা ও বাস্তবতার আলোকে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও মূল্যায়নপদ্ধতির পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিশোধনের কাজটিও এই প্রতিষ্ঠান করে থাকে।

বাংলাদেশের শিক্ষার স্তরবিন্যাসে মাধ্যমিক স্তরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বইটি এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স, মানসপ্রবণতা ও কৌতূহলের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং একইসাথে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক। বিষয়জ্ঞানে সমৃদ্ধ শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞগণ **হিন্দুধর্ম শিক্ষা** পাঠ্যপুস্তকটি ও সম্পাদনা করেছেন। আশা করি বইটি বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান পরিবেশনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মনন ও সৃজনের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২-এর আলোকে প্রণীত মাধ্যমিক স্তরের অষ্টম শ্রেণির হিন্দুধর্ম শিক্ষা পাঠ্যপুস্তকটিতে হিন্দুধর্মের তাত্ত্বিক বিষয় ও বিধানসমূহ এবং এ ধর্মের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি শিক্ষার্থীদের বাস্তব জীবন ও কর্মে প্রতিফলিত করার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া হিন্দুধর্মের বিধানসমূহ, হিন্দুধর্ম গ্রন্থসমূহে বর্ণিত বিভিন্ন জীবনাদর্শ, উপাখ্যান, অবতার, মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারীদের জীবনচরিত ও বাণী সম্পর্কে এ বইটিতে আলোচনা করা হয়েছে। আশা করা যায়, এ সকল বিষয় শিক্ষার্থীদের নৈতিক গুণাবলি যেমন– সততা, উদারতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, সৎ সাহস, সংযম, সহনশীলতা, নারীর প্রতি মর্যাদাবোধ, অসাম্প্রদায়িকতা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, দেশপ্রেম, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করবে।

পাঠ্যবই যাতে জবরদস্তিমূলক ও ক্লান্তিকর অনুষঙ্গ না হয়ে বরং আনন্দাশ্রয়ী হয়ে ওঠে, বইটি রচনার সময় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে বইটিকে যথাসম্ভব দুর্বোধ্যতামুক্ত ও সাবলীল ভাষায় লিখতে। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের সর্বশেষ সংস্করণকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও তথ্য-উপাত্ত ও ভাষাগত কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। এই বইয়ের মানোন্নয়নে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

পরিশেষে বইটি রচনা, সম্পাদনা ও অলংকরণে যাঁরা অবদান রেখেছেন, তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অক্টোবর, ২০২৫

প্রফেসর রবিউল কবীর চৌধুরী
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	ঈশ্বরের স্বরূপ	১ – ৯
দ্বিতীয়	ধর্মগ্রন্থ	১০ – ২৪
তৃতীয়	হিন্দুধর্মের স্বরূপ ও বিশ্বাস	২৫ – ৩৮
চতুর্থ	নিত্যকর্ম ও যোগাসন	৩৯ – ৪৮
পঞ্চম	দেব-দেবী ও পূজা-পার্বণ	৪৯ – ৬০
ষষ্ঠ	ধর্মীয় উপাখ্যানে নৈতিক শিক্ষা	৬১ – ৭১
সপ্তম	অবতার ও আদর্শ জীবনচরিত	৭২ – ৯৫
অষ্টম	হিন্দুধর্ম ও নৈতিক মূল্যবোধ	৯৬ – ১১২

প্রথম অধ্যায়

ঈশ্বরের স্বরূপ

কত বিচিত্র আমাদের প্রকৃতি ও পরিবেশ। ওপরে অনন্ত আকাশ, নিচে জীবকুল, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত। আমাদের পৃথিবী অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ ও বৈচিত্র্যে ভরপুর, যেমন; ঋতুচক্রের আবর্তন, দিন-রাত্রির পালাবদল, গ্রহাণুপুঞ্জের আপন কক্ষপথে নিয়মতান্ত্রিকভাবে আবর্তিত হওয়া প্রভৃতি। অনন্ত আকাশে চন্দ্র, সূর্যসহ অসংখ্য গ্রহ, উপগ্রহ ও নক্ষত্র রয়েছে। এসব গ্রহ, নক্ষত্র ও উপগ্রহ নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরছে। সংঘাতের সৃষ্টি হচ্ছে না। সবকিছুই একটি গভীর ঐক্য ও শৃঙ্খলার মাধ্যমে চলছে। এ সবকিছুর কারণ ঈশ্বর এবং তিনিই সবকিছুর নিয়ন্ত্রক। অন্যথায় এ মহাবিশ্বের সবকিছু যথানিয়মে আবর্তিত হতো না।

ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। তিনি নিরাকার, শাশ্বত বা নিত্য ও অবিনশ্বর।

এ বিশ্বে যাকিছু ঘটছে তার প্রত্যেকটির পেছনেই একটি কারণ আছে। এ কারণেরও কারণ আছে। মহাবিশ্ব সৃষ্টির কারণ অনুসন্ধান করলে অনেক কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে। তবে সৃষ্টির প্রথম কারণকে বলা হয় ঈশ্বর।

ঈশ্বর যখন নিরাকার, তখন তিনি ব্রহ্ম। আবার তিনিই ভগবান এবং জীবের মধ্যে আত্মারূপে অবস্থান করেন। জ্ঞানী, যোগী ও ভক্তগণ নিজ-নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি ও ব্যাখ্যা করছেন। চিরশান্তি বা মোক্ষ লাভের জন্য ভক্ত ঈশ্বরের কাছে স্তুতি করেন এবং তাঁর কাছে প্রার্থনা জানান। এ অধ্যায়ে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়–এ ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ব্রহ্ম, ঈশ্বর, ভগবান–এ ধারণাসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ঈশ্বরের আত্মারূপে অবস্থান ও স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- জ্ঞানী, যোগী ও ভক্তের দৃষ্টিতে ঈশ্বরের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ধর্মগ্রন্থ থেকে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে একটি প্রার্থনামূলক সংস্কৃত শ্লোক ও একটি বাংলা কবিতা অর্থসহ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধির মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস স্থাপন করতে পারব।

পাঠ ১ : ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়

ঈশ্বর এ বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। তিনিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল কিছুর নিয়ন্ত্রক। দেব-দেবীরা তাঁরই গুণ বা শক্তির প্রতিভূ। তিনি এক ও অদ্বিতীয়।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ঈশ্বরের একত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে–

একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা।
কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ
সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ॥ (৬/১১)

সরলার্থ: এক ঈশ্বর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবং সকল জীবের মধ্যে প্রচ্ছন্নরূপে অবস্থান করছেন। তিনি সর্বব্যাপী, সকল জীবের আত্মা, সকল কাজের কর্তা এবং সকল জীবের আবাসস্থল। তিনি সকল কিছু দেখেন, সকল জীবকে চেতনা দান করেন। তিনি নিরাকার-নির্গুণ ব্রহ্ম।

ঈশ্বর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে এক শৃঙ্খলার মাধ্যমে পরিচালিত করছেন। গ্রহ-উপগ্রহ ও নক্ষত্রসমূহ এ মহাকাশে নির্দিষ্ট গতিপথে আবর্তিত হচ্ছে। জীব ও জড়বস্তু সবকিছুই একটি শৃঙ্খলার মধ্যে আবর্তিত হচ্ছে। জীব জন্মলাভ করছে, আবার আয়ুশেষে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে দেহত্যাগ করছে। হিন্দুধর্মানুসারে জীবের দেহের ধ্বংস আছে, কিন্তু জীবাত্মার ধ্বংস নেই।

পৃথিবীর সকল জীব ও জড়ের মধ্যে একটা শৃঙ্খলা বিরাজ করছে। একজন কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক না থাকলে এ মহাবিশ্বের সকল কিছু শৃঙ্খলার মধ্যে পরিচালিত হতো না। এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একাধিক ঈশ্বর থাকলে মহাকাশের গ্রহ-নক্ষত্রগুলো নিয়মতান্ত্রিকভাবে সুনির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরতে পারত না। সকল জীব ও জড়ের মধ্যে শৃঙ্খলা থাকত না।

ধ্যান-ধারণা ও মানুষের অভিজ্ঞতা থেকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায়। ঈশ্বর নিরাকার। তাঁকে চোখে দেখা যায় না কিন্তু তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁকে অনুভব করা যায়। যেমন বিদ্যুৎ চোখে দেখা যায় না কিন্তু তার কাজের মাধ্যমে তাকে অনুভব করা যায়। ধর্ম ও সততা ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস আনয়ন করে। এর মাধ্যমে নৈতিক চিন্তাশক্তি বিকশিত হয়। উপনিষদে উল্লেখ আছে যে, ‘সূর্য তাঁকে প্রকাশ করতে পারে না; চন্দ্র, তারকা,

বিদ্যুৎ, অগ্নিও তাঁকে প্রকাশ করতে পারে না; সর্বত্র তিনিই প্রকাশিত আছেন এবং সকল কিছুই তিনি প্রকাশ করেন।' উপনিষদে আরও বলা হয়েছে, 'প্রাণী ও অপ্রাণী যেকোন বিষয় বা পদার্থ যেস্থান থেকে জন্মলাভ করে, মৃত্যু বা ধ্বংসের মাধ্যমে আবার যাঁর কাছে ফিরে যায়, তিনিই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর।'

ঈশ্বর সর্বজ্ঞ। তিনি সবকিছু জানেন। তাই তিনি পুণ্যাত্মাকে সুখী করেন, অপরাধীকে শাস্তি দেন এবং অদৃশ্যভাবে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি সবকিছুর একমাত্র নিয়ন্ত্রক।

একক কাজ : ঈশ্বরের একত্ব সম্পর্কে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের স্তোত্রটি আবৃত্তি করো।

নতুন শব্দ : শাশ্বত, অবিনশ্বর, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।

পাঠ ২ : ব্রহ্ম, ঈশ্বর, ভগবান ও জীবাত্মা

ঈশ্বরের বিভিন্ন নাম রয়েছে এবং আমরা তাঁকে বিভিন্ন নামে ডাকি। যেমন; ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ঈশ্বর ও ভগবান। ঋষিরা ঈশ্বরকে ব্রহ্ম বা পরমাত্মা, ভগবান ও আত্মা বা জীবাত্মারূপে উপলব্ধি করেছেন এবং তাঁর স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। আমরা ঋষিদের বর্ণনানুসারে ব্রহ্ম, ঈশ্বর ও ভগবানের পরিচয় জানব।

ব্রহ্ম

হিন্দুধর্ম অনুসারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মেরই সৃষ্টি। ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, সকল জীব ও জড়ের স্রষ্টা। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাকিছু ঘটছে, সবই তাঁর কারণে। নিরাকার ব্রহ্মকে বোঝাবার জন্য ঋষিরা 'ওঁ'-এ প্রতীকী শব্দটি ব্যবহার করেছেন। ব্রহ্ম শব্দের অর্থ বৃহৎ। 'বৃহত্ত্বাৎ ব্রহ্ম' অর্থাৎ বৃহৎ বলেই তাঁর নাম ব্রহ্ম। আবার ব্রহ্মকে বলা হয়েছে তিনি সত্য। অর্থাৎ সত্যই ব্রহ্ম। কোনো কোনো ঋষি আবার বলেছেন, ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ। আমাদের আনন্দ ব্রহ্মেরই আনন্দ। এই ব্রহ্মকেই আবার বলা হয়েছে পরমাত্মা।

ঈশ্বর

'ঈশ্বর' শব্দের অর্থ প্রভু। তিনি সকল জীবের সকল কাজের প্রভুত্বকারী। ব্রহ্ম যখন জীবের ওপর প্রভুত্ব করেন এবং জীবকুলে সকল কাজ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করেন তখন তাঁকে ঈশ্বর বলা হয়। এভাবে নিরাকার ঈশ্বর তাঁর নিজের ইচ্ছা অনুসারে নিজের আনন্দের জন্য নিজেকেই নানারূপে প্রকাশ করেন।

ঈশ্বরই অবতার। তিনি যখন দুষ্টের দমন করেন এবং ন্যায়-নীতি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য পৃথিবীতে নেমে আসেন, তখন তাঁকে অবতার বলা হয়। যেমন; মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, বামন, রাম প্রভৃতি।

আবার ঈশ্বরের কোনো গুণ বা শক্তি যখন আকার ধারণ করে, তখন তাঁকে দেবতা বা দেব-দেবী বলে। যেমন; শক্তির দেবী দুর্গা, বিদ্যার দেবী সরস্বতী ইত্যাদি।

ঈশ্বর এক। বিভিন্ন অবতার বা দেব-দেবী এক ঈশ্বরেরই বিভিন্ন শক্তির প্রকাশ। সবই এক ঈশ্বরের লীলা।

২০২৬

ভগবান

ঈশ্বরকে আমরা সর্বশক্তিমান হিসেবে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করি। সর্বশক্তিমান বা সবকিছুর নিয়ন্ত্রক বলে আমরা তাঁকে সমীহ করি। তাঁকে ঘিরে আমাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ভালোবাসার সৃষ্টি হয়। ভালোবাসার অপর নাম মায়া। এই মায়ার জালে সকল জীব আবদ্ধ। আমাদের কোনোকিছুর অভাব ঘটলে বা আমরা গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হলে ঈশ্বর আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হন। তবে আমরা তাঁকে দেখতে পাই না, কিন্তু উপলব্ধি করতে পারি। ভক্তের নিকট ঈশ্বর ভগবানরূপে আবির্ভূত হয়ে থাকেন। ভক্তের কাছে ভগবান আনন্দময়। 'ভগ' শব্দটির অর্থ ঐশ্বর্য বা গুণ। ঈশ্বরের ছয়টি গুণ ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য। এই ছয়টি ভগ বা ঐশ্বর্য আছে বলে ঈশ্বরকে ভগবান বলা হয়। ভগবান ভক্তের ডাকে সাড়া দেন ও লীলা করেন। সুতরাং, ঈশ্বর যখন ভক্তদের কৃপা করেন, তাদের দুঃখ দূর করে তাদের মঙ্গল করেন, তখন তাঁকে ভগবান বলা হয়।

জীবাত্মা

ঈশ্বরের অন্য নাম পরমাত্মা যখন জীবের মধ্যে অবস্থান করেন তখন তাঁকে বলা হয় জীবাত্মা। জীবাত্মারূপে তিনি মানুষ, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ সবকিছুর মধ্যেই অবস্থান করেন। তাই ঈশ্বরভক্ত যাঁরা তাঁরা সব জীবকেই সমান দৃষ্টিতে দেখেন। কারো প্রতি হিংসা করেন না। কারণ জীবের প্রতি হিংসা করলে ঈশ্বরকেই হিংসা করা হয়।

পাঠ ৩ : জ্ঞানী, যোগী ও ভক্তের দৃষ্টিতে ঈশ্বর

জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত ঈশ্বরকে নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে উপলব্ধি করেছেন এবং বর্ণনা করেছেন। জ্ঞানী জ্ঞানের দৃষ্টিতে, যোগী যোগসাধনার মধ্য দিয়ে এবং ভক্ত ভক্তির মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন।

ঈশ্বরকে যিনি জ্ঞানের মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করেছেন তিনিই জ্ঞানী। ধর্মপালন ও ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের জন্য গীতায় বিভিন্ন পথের কথা বলা হয়েছে। ঈশ্বর লাভের এসব পথকে যোগসাধনা বলে। যাঁরা আত্মার উপাসনা করেন এবং যোগসাধনার সঙ্গে সম্পৃক্ত হন, তাঁদের যোগী বলা হয়। আবার যাঁরা ভক্তির মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি করেন তাঁরা হলেন ভক্ত। এখন জ্ঞানী, যোগী ও ভক্তের দৃষ্টিতে ঈশ্বরের যেস্বরূপ বর্ণিত হয়েছে, সংক্ষেপে তা আলোচনা করা হলো।

জ্ঞানীর দৃষ্টিতে ঈশ্বর

যাঁরা সকল বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ করে কেবল সর্বব্যাপী ও নিরাকার ব্রহ্মকে উপাসনা করেন এবং ব্রহ্মেই সন্তুষ্ট থাকেন, তাঁদের জ্ঞানী বলা হয়। জ্ঞানীদের কাছে ঈশ্বরই ব্রহ্ম, যিনি এ মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। জ্ঞানী ব্যক্তিরা মানুষের জন্য, জীবের জন্য এবং ঈশ্বরের ভালোবাসা লাভের জন্য কাজ করেন। জ্ঞানযোগে তাঁরা এসব করেন। জ্ঞান অর্থ জানা, 'যোগ' অর্থ যুক্ত হওয়া। তাই জ্ঞানী শব্দের অর্থ দাঁড়ায় কোনো বিষয় সম্পর্কে জানার সঙ্গে যুক্ত যিনি।

জ্ঞান দুই প্রকার বিদ্যা ও অবিদ্যা। বিদ্যা ও অবিদ্যা যথাক্রমে পরা ও অপরা নামেও পরিচিত। বিদ্যার দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। সর্বভূতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধ হয়। জাগতিক বিষয়ে বৈরাগ্যের উদয় হয় এবং মুক্তির পথ প্রশস্ত হয়। অবিদ্যার দ্বারা জাগতিক বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানলাভ হয় কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না। তাই ধর্মশাস্ত্রে জ্ঞানী বলতে আত্মা বা ব্রহ্ম সম্বন্ধে জ্ঞানী ব্যক্তিদের বোঝানো হয়েছে।

যোগীর দৃষ্টিতে ঈশ্বর

যাঁরা একাগ্রতা সহকারে মনের অন্তস্তল থেকে ঈশ্বরের অনুসন্ধান করেন, সকল কামনা-বাসনা দূর করতে সমর্থ হন, তাঁদের যোগী বলা হয়। তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ।

যোগীদের দৃষ্টিতে ঈশ্বর পরমাত্মা। এই পরমাত্মাই জীবাত্মারূপে জীবের মধ্যে অবস্থান করেন। তাই যোগীর কাছে জীবও ঈশ্বর। মহাযোগী ও মহাজ্ঞানী স্বামী বিবেকানন্দ এ মহাবিশ্বের সকল কিছুকেই বহুরূপে ঈশ্বরের প্রকাশ বলে অভিহিত করেছেন। ঈশ্বর সম্পর্কে তাঁর অমর বাণী **'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'** অর্থাৎ জীবের সেবা করলেই ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ।

ভক্তের দৃষ্টিতে ঈশ্বর

যাঁরা সংসারের বিষয় ও বৈষয়িক কর্মের মধ্যে থেকে সর্বশক্তিমান ভগবানের উপাসনা করেন, তাঁদের ভক্ত বলা হয়। ভক্তরা সর্বজীবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করেন এবং সেভাবেই জীবসেবার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সেবা করেন। ভক্তের নিকট ঈশ্বর ভগবান। তিনি রসময়, আনন্দময় ও গুণময়।

কখনো কখনো ভগবান ভক্তের সেবা করেন। ভক্তের বোঝা বহন করেন। ভক্তও ভগবানের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেন। নিজের সকল কাজকে ভগবানের কাজ হিসেবে সম্পাদন করেন। ভগবানের প্রতি ভক্তের মনে নিবিড় ও গভীর ভালোবাসা বিরাজ করে। শুধু তাই নয়, তাঁর সৃষ্টিকেও যাতে গভীরভাবে ভালোবাসতে পারেন সেজন্য ভক্ত ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন।

নতুন শব্দ: সমর্পণ, আত্মজ্ঞান, বিষয়জ্ঞান, মহাযোগী।

পাঠ ৪ : ঈশ্বরের আত্মারূপে অবস্থান

ঈশ্বর বা ব্রহ্মের আরেকটি নাম পরমাত্মা। এ পরমাত্মা জীবের মধ্যে অবস্থান করেন বলেই জীবের চেতনাশক্তি আছে। এই চেতনাই জীবাত্মা। জীবাত্মার ধ্বংস নেই। কেবল দেহের ধ্বংস হয়। আর দেহের এ ধ্বংসকেই বলা হয় মৃত্যু।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবের মধ্যে আত্মারূপে নিরাকার ব্রহ্ম বা পরমাত্মার ক্রিয়াশীল থাকার বিষয়টি চমৎকারভাবে তাঁর একটি কবিতায় প্রকাশ করেছেন:

সীমার মাঝে, অসীম, তুমি বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর। (গীতাঞ্জলি)

জীবের দেহের সীমার মধ্যে অসীম পরমাত্মা বা ঈশ্বর বিরাজ করেন। তাঁর ক্রিয়াশীলতার কারণেই আমাদের জীবন এত সুন্দর, এত মধুর।

ওপরের আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ব্রহ্মই ঈশ্বর, ভগবান এবং জীবাত্মা। তিনি এক ও অদ্বিতীয়।

দলীয় কাজ: ঈশ্বরের বিভিন্ন রূপের একটি তালিকা তৈরি করো।

পাঠ ৫: প্রার্থনামূলক মন্ত্র ও বাংলা কবিতা

ক. প্রার্থনামূলক মন্ত্র

দৃতে দৃংহ মা মিত্রস্য মা চক্ষুষা
সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষন্তাম্।
মিত্রস্যাহং চক্ষুষা সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষে।
মিত্রস্য চক্ষুষা সমীক্ষামহে॥ (শুক্লযজুর্বেদ-৩৬।১৮)

সরলার্থ: হে ঈশ্বর, আমাকে এমন দৃঢ় করো যাতে সকল প্রাণী আমাকে বন্ধুর চোখে দেখে। আমিও যেন তাদের বন্ধুর চোখে দেখি। আমরা সকলেই যেন পরস্পরকে বন্ধুর চোখে দেখি।

ব্যাখ্যা: শুক্লযজুর্বেদের এ মন্ত্রে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে – ঈশ্বর যেন আমাদের জ্ঞানে ও শক্তিতে এমন দৃঢ় করেন, যাতে সকল প্রাণী আমাদের সঙ্গে বন্ধুর মতো আচরণ করে। আমরাও যেন সকলের সঙ্গে বন্ধুর মতো আচরণ করি। কাউকে যেন হিংসা না করি। এভাবে আমরা সকলেই যেন সকলের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করি। ফলে জীবন হবে শান্তিময়। বন্ধুত্বের মধ্য দিয়ে শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হোক এ প্রার্থনা-মন্ত্রটির মধ্য দিয়ে সেই প্রত্যাশাই ব্যক্ত করা হয়েছে।

খ. প্রার্থনামূলক বাংলা কবিতা

অন্তর মম বিকশিত করো অন্তরতর হে –
নির্মল করো, উজ্জ্বল করো, সুন্দর করো হে॥
জাগ্রত করো, উদ্যত করো, নির্ভয় করো হে।
মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে॥
যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, মুক্ত করো হে বন্ধ।
সঞ্চার করো সকল কর্মে শান্ত তোমার ছন্দ॥
চরণপদ্মে মম চিত, নিস্পন্দিত করো হে।
নন্দিত করো, নন্দিত করো, নন্দিত করো হে॥

(গীতবিতান, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ব্যাখ্যা: কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এ কবিতার মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে পবিত্র, উদার ও সুন্দর মন এবং সচেতনতা, সক্রিয়তা ও নির্ভীকতা প্রার্থনা করা হয়েছে। ঈশ্বর যেন আমাদের ঐক্যবদ্ধ করেন এবং ঈশ্বরের সৃষ্টিতে যেমন শৃঙ্খলা রয়েছে, আমাদের সকল কাজেও যেন তেমন শৃঙ্খলা থাকে। আমরা যেন নির্ভয় ও নিঃসংশয়ে সকল কাজ করতে পারি এবং সকলের তথা বিশ্বের সকল প্রাণীর মঙ্গল সাধন করতে পারি। সকল বাধাবিঘ্ন ছিন্ন করে আমরা সকল মঙ্গল ও সুন্দর কাজের মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হতে পারি। সবশেষে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে, যেন ঈশ্বরের প্রতি আমাদের প্রগাঢ় ভক্তি থাকে। ঈশ্বর যেন আমাদের মঙ্গল করেন এবং আনন্দে রাখেন।

টীকা

যজুর্বেদ: হিন্দুধর্মের একটি মৌলিক গ্রন্থ যজুর্বেদ। এতেও ঋগ্‌বেদের মতো দেবতাদের উদ্দেশে স্তুতি ও প্রার্থনামূলক মন্ত্র রয়েছে। যজুর্বেদের দুইটি অংশ – শুক্ল ও কৃষ্ণ। যজুর্বেদের প্রধান বর্ণনার বিষয় যজ্ঞ ও যজ্ঞ-প্রণালী।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ: বারোটি প্রধান উপনিষদের মধ্যে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ একটি। এ উপনিষদে আমরা কোথা থেকে জন্মেছি, কীভাবে জীবন ধারণ করছি এবং প্রলয়ের পরে কোথায় থাকব এসব বিষয়ে আলোচনা রয়েছে। এ উপনিষদে ব্রহ্মের স্বরূপও ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

একক কাজ: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রার্থনামূলক কবিতাটির ভাবার্থ লেখো।

নতুন শব্দ: নিঃসংশয়, নিস্পন্দিত, সঞ্চার, সক্রিয়তা, নির্ভীকতা।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১। যারা ব্রহ্মেই সন্তুষ্ট থাকেন তাদেরকে কী বলে?

ক. উপাসক

খ. ভক্ত

গ. যোগী

ঘ. জ্ঞানী

২। যোগীর দৃষ্টিতে ঈশ্বর—

i. সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন

ii. প্রতিটি জীবের মধ্যে আছেন

iii. মনের সকল ইচ্ছে পূরণ করেন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও iii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i,ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

সজল তার বন্ধু ইন্দ্রজিতকে সাথে গল্পে গল্পে জানায় - সে একটি ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে শপথ নিয়েছে যে, সে আর কারও সাথে কখনো শত্রুতা করবে না। ইন্দ্রজিত তার কথা শুনে ধর্মগ্রন্থ পাঠে উৎসাহিত হয়। সে সকাল বিকাল ছন্দের মাধ্যমে ঈশ্বরের উপাসনা ও অন্যদের মঙ্গল কামনা করে।

৩. সজল কোন গ্রন্থের জ্ঞান কাজে লাগিয়ে শপথ গ্রহণ করেছে ?

ক. যজুর্বেদ খ.অথর্ববেদ

গ.শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ঘ. কঠোপনিষদ

৪. ইন্দ্রজিতের মতো তোমার পাঠ্যবইয়ে যে প্রার্থনামূলক কবিতা আলোচিত হয়েছে তার মূল বিষয় হচ্ছে–

i. সুন্দর কাজের মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানো

ii. ঈশ্বরের মতো সকল কাজে যেন শৃঙ্খলা থাকে

iii. মানুষ যেন সকল প্রাণীকে বন্ধুর চোখে দেখে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

জয়া দেবী বাড়িতে কোনো পূজা করার আগে যত্ন সহকারে সিঁদুর দিয়ে একটা প্রতীক আঁকেন। তাঁর স্বামী ব্যবসায়ী সুবল বাবুর দোকানে কেউ সাহায্যের জন্য এলে তিনি ফিরিয়ে দেন না। তিনি মনে করেন এর মাধ্যমে ঈশ্বরের সেবা সম্ভব।

ক. জীবাত্মা কাকে বলে?

খ. ঈশ্বর কোন রূপে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য পৃথিবীতে আসেন? ব্যাখ্যা করো।

গ. পূজার সময় জয়া দেবী প্রতীকের মাধ্যমে যার স্তুতি শুরু করেন তা ব্যাখ্যা করো।

ঘ. সুবল বাবুর উপলব্ধিকে কি তুমি সমর্থন করো? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১.ব্রহ্ম কখন ঈশ্বর হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন?

২ ঈশ্বর কীভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিচালনা করেন?

৩.আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি কেন?

দ্বিতীয় অধ্যায়

ধর্মগ্রন্থ

যেগ্রন্থে ধর্ম ও কল্যাণময় জীবনের কথা বলা হয়েছে তাকে ধর্মগ্রন্থ বলে। বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা, শ্রীশ্রীচণ্ডী প্রভৃতি আমাদের উল্লেখযোগ্য ধর্মগ্রন্থ। বেদ আমাদের আদি ও প্রধান ধর্মগ্রন্থ। বেদ চিরন্তন ও শাশ্বত। 'বেদ' মানে জ্ঞান। প্রাচীন ঋষিদের ধ্যানে পাওয়া পবিত্র জ্ঞান। এ জ্ঞান হচ্ছে জগৎ-জীবন ও তার উৎস পরমপুরুষ, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর সম্পর্কে জ্ঞান। বেদকে কেন্দ্র করে রচিত ধর্মভিত্তিক বিশাল সাহিত্যকে বলা হয় বৈদিক সাহিত্য। আর মহাভারতের অংশবিশেষ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা সংক্ষেপে গীতা হিসেবে পৃথক গ্রন্থের মর্যাদা পেয়েছে। গীতায় কর্মকে 'যজ্ঞ' বলা হয়েছে। এখানে রয়েছে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব সমন্বয় এবং বাস্তব জীবনে চলার প্রয়োজনীয় নৈতিক শিক্ষা ও উপদেশ।

এ অধ্যায়ে বৈদিক সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, চতুর্বেদের বিষয়বস্তু ও ধর্মাচরণে তার প্রভাব এবং শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় বর্ণিত চতুর্বর্ণ, কর্তব্যপালন, সাম্য, চরিত্র গঠনে মানবিক গুণাবলি এবং ভক্তি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- বৈদিক সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে পারব;
- চতুর্বেদের বিষয়বস্তু বর্ণনা করতে ও ধর্মাচরণে তার প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব;
- শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা অনুসারে চতুর্বর্ণ, কর্তব্যপালন, সাম্য, চরিত্র গঠনে মানবিক গুণাবলি ও ভক্তির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- জীবন ও ধর্মাচরণে বেদ ও শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার শিক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে পারব।

পাঠ ১ : বৈদিক সাহিত্যের পরিচয়

বেদ আমাদের আদি ধর্মগ্রন্থ। 'বেদ' মানে জ্ঞান। জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রগাঢ় চেষ্টা বা সাধনার প্রয়োজন। জ্ঞান অর্জন করতে হলে নিমগ্ন হতে হয় গভীর সাধনায়। গভীর সাধনায় নিমগ্ন হওয়াকে বলা হয় ধ্যান। যাঁরা সত্য বা জ্ঞান এবং সৃষ্টি ও স্রষ্টার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে পারতেন, তাঁদের বলা হতো ঋষি। বেদ এই ঋষিদের ধ্যানে পাওয়া পবিত্র জ্ঞান। এ হচ্ছে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে এবং জগৎ ও জীবনের উৎস পরমপুরুষ, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর সম্পর্কে জ্ঞান।

আমাদের জীবন, জীবনের উৎস, পরমপুরুষ, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর প্রভৃতি সম্পর্কে বেদ বা সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ প্রভৃতি গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থসমূহ ভিন্ন ধরনের হলেও ধর্মীয় নানা দিক থেকে পারস্পরিকভাবে সম্পর্কিত। এভাবেই বেদকে কেন্দ্র করে ধর্মভিত্তিক এক বিশাল সাহিত্য গড়ে উঠেছে। একেই বলা হয় বৈদিক সাহিত্য।

বৈদিক সাহিত্যের অংশ হিসেবে যে বিষয়গুলো এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো:

চতুর্বেদ

বেদের আরেক নাম সংহিতা। সংহিতা মানে সংগ্রহ বা সংকলন। সমগ্র বেদ বা সংহিতাগুলোকে চার ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা;- ১. ঋগ্বেদ-সংহিতা ২. যজুর্বেদ-সংহিতা ৩. সামবেদ-সংহিতা এবং ৪. অথর্ববেদ- সংহিতা। এ সংহিতাগুলোকে একত্রে বলা হয় চতুর্বেদ।

২০২৫

ব্রাহ্মণ

বেদের দুটি অংশ—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। বেদের যে অংশে মন্ত্রের ব্যাখ্যা এবং বিভিন্ন যজ্ঞে তাদের প্রয়োগ বা ব্যবহারের কথা আলোচনা করা হয়েছে তাকে 'ব্রাহ্মণ' বলা হয়। ব্রাহ্মণগুলো গদ্যে রচিত। ব্রাহ্মণের বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে বিধি অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ কর্ম অনুষ্ঠানের নির্দেশ, বেদমন্ত্রের অর্থ প্রসঙ্গে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা, বিরোধী মতের সমালোচনা প্রভৃতি ।

আরণ্যক

আরণ্যক ও উপনিষদ ব্রাহ্মণের অংশ। ব্রাহ্মণে বেদের কর্মকাণ্ড আর আরণ্যক ও উপনিষদে জ্ঞানকাণ্ড আলোচনা করা হয়েছে। যা অরণ্যে রচিত তাকে আরণ্যক বলে। আরণ্যকের বিষয় ধর্মদর্শন। কার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ, সৃষ্টির উৎস কী ইত্যাদি আধ্যাত্মিক বিষয় এতে আলোচিত হয়েছে। গভীর জ্ঞানকে অরণ্য বা গভীর বনের সাথে তুলনা করা হয়েছে। অর্থাৎ গভীর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বিষয় যাতে বর্ণনা করা হয়েছে তা-ই আরণ্যক। ঐতরেয় আরণ্যক, বৃহদারণ্যক প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য আরণ্যক।

উপনিষদ

আরণ্যকে যে অধ্যাত্মবিদ্যার সূচনা, উপনিষদে তা বিস্তার ও গভীরতা লাভ করেছে। উপ-নি-সদ্ + ক্বিপ্ = উপনিষদ।

এখানে 'উপ' অর্থ সমীপে বা নিকটে, 'নি' অর্থ নিশ্চয়, 'সদ্' ধাতুর অর্থ অবস্থান। অর্থাৎ গুরুর নিকটে বসে নিশ্চয়ের সঙ্গে যে জ্ঞান অর্জন করা হয় তাকে উপনিষদ বলে। কিন্তু এ কথায় উপনিষদের বিষয়বস্তু স্পষ্ট হয় না। জীবের মূলীভূত সত্তা হচ্ছে তার আত্মা। এই আত্মা পরমাত্মা বা ব্রহ্মেরই অংশ। সুতরাং জীব ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নয়। এই ব্রহ্ম নিরাকার। আত্মারূপে জীবের মধ্যে তাঁর অবস্থান। তিনিই সবকিছুর মূলে। এই ব্রহ্মজ্ঞান উপনিষদের বিষয়বস্তু।

উপনিষদের সংখ্যা শতাধিক। সেগুলোর মধ্যে **১২** খানা প্রাচীন উপনিষদ। বাকিগুলো পরবর্তী সময়ের। মহাভারতের অন্তর্গত হয়েও পৃথক গ্রন্থ হিসেবে মর্যাদাপ্রাপ্ত শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাকে উপনিষদের সার বলা হয়েছে। ঐতরেয়, কঠ, কেন, ছান্দোগ্য প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য উপনিষদ।

একক কাজ: ছকে প্রদত্ত প্রতিটি গ্রন্থ সম্পর্কে দুটি করে বাক্য লিখে ঘরগুলো পূরণ করো।	চতুর্বেদ	ব্রাহ্মণ	আরণ্যক	উপনিষদ

বেদাঙ্গ

বেদপাঠের সহায়ক হিসেবে আরও কয়েক রকমের রচনা রয়েছে। বেদপাঠের অঙ্গ বলে এগুলোকে বলা হয় বেদাঙ্গ। বেদাঙ্গ বেদপাঠের সহায়ক শাস্ত্র। বেদাঙ্গের জ্ঞান না থাকলে বেদ অধ্যয়ন সম্পূর্ণ হয় না। বেদাঙ্গগুলো সূত্রাকারে রচিত। বেদাঙ্গ ছয় প্রকার, যথা; শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ। এই ছয়টিকে একসঙ্গে বলা হয় ষড়ঙ্গ।

১. **শিক্ষা** – 'শিক্ষা' শব্দটি এখানে সামগ্রিকভাবে বিদ্যার্জন বা জ্ঞানার্জন অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। 'শিক্ষা' বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে ধ্বনিতত্ত্ব, বিশেষ করে উচ্চারণতত্ত্বসহ নির্ভুলভাবে বৈদিক শব্দ উচ্চারণের পদ্ধতিকে।

২. **কল্প** – যজ্ঞাদি কর্মকাণ্ড যার দ্বারা কল্পিত ও সমর্থিত হয় তাকে কল্প বলা হয়। 'কল্প' হচ্ছে নির্ভুলভাবে বৈদিক যাগযজ্ঞ ও ক্রিয়াকাণ্ড অনুষ্ঠানের পদ্ধতি।

৩. **ব্যাকরণ** – ব্যাকরণে ভাষাকে বিশ্লেষণ করে সূত্রায়িত করা হয় এবং শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করা হয়। ভাষা ব্যবহারের সময় তার অর্থশুদ্ধির জন্য ব্যাকরণ পাঠ করা প্রয়োজন। সে কারণে ব্যাকরণও একটি বেদাঙ্গ।

৪. **নিরুক্ত** – বেদে ব্যবহৃত শব্দাবলির উৎপত্তি, অর্থ প্রভৃতির আলোচনা করা হয়েছে নিরুক্ত নামক বেদাঙ্গে।

৫. **ছন্দ** – বেদাঙ্গের অন্যতম অঙ্গ হচ্ছে ছন্দ। বেদের যেসব মন্ত্র ছন্দবদ্ধ সেগুলোর অর্থবোধ এবং যথাযথ আবৃত্তির জন্য ছন্দের জ্ঞান অপরিহার্য।

৬. **জ্যোতিষ** – বৈদিক যুগে বিশেষ বিশেষ তিথি-নক্ষত্রে বিশেষ বিশেষ যজ্ঞ করার ব্যবস্থা ছিল। জ্যোতিষে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যজ্ঞে ফলসিদ্ধির জন্য জ্যোতিষের আবশ্যক।

একক কাজ: বেদাঙ্গের ছয়টি অঙ্গের প্রত্যেকটি সম্পর্কে একটি করে বাক্য লেখো।

নতুন শব্দ: চতুর্বেদ, কল্প, নিরুক্ত, ষড়ঙ্গ, জ্যোতিষ, আরণ্যক, ঐতরেয়, কঠ, কেন, ছান্দোগ্য, প্রগাঢ়, নিমগ্ন, সংহিতা।

পাঠ ২ : চতুর্বেদের বিষয়বস্তু

বেদ ঈশ্বরের বাণী। ঋষি মনু বলেছেন— **'বেদঃ অখিলধর্মমূলম্'**— অর্থাৎ বেদ হচ্ছে সকল ধর্মের মূল। এখানে সত্য ও জ্ঞানের নানা বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে। এ সত্য বা জ্ঞান অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে উপলব্ধি করতে হয়। বেদে বিভিন্নভাবে ঈশ্বর ও দেবতাদের স্তুতি বা প্রশংসা করা হয়েছে। ঈশ্বরের বিভিন্ন শক্তিকে দেবতা বলে। অগ্নি, বায়ু, উষা, রাত্রি প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির মধ্যে ঈশ্বরের অসীম ক্ষমতা উপলব্ধি করে বৈদিক ঋষিগণ তাঁদের প্রশংসা করেছেন। তাঁদের স্তুতি ও বন্দনা ঋষিদের কণ্ঠে কবিতার আকারে বাণীরূপ পেয়েছে। গভীর ধ্যানে এই বাণী বা কবিতা ঋষিগণ ঈশ্বরের কাছ থেকে পেয়েছেন। তাই ঋষিরা বলেছেন, তাঁরা বেদ দর্শন করেছেন। এজন্য বেদকে বলা হয় অপৌরুষেয়। অর্থাৎ বেদ কোনো পুরুষ বা ব্যক্তির দ্বারা সৃষ্ট নয়, তা ধ্যানে দৃষ্ট।

বেদের সঙ্গে দেবতাদের প্রসঙ্গ যুক্ত। বিভিন্ন স্তব-স্তুতির মাধ্যমে ঋষিগণ দেবতাদের মাহাত্ম্য তুলে ধরেছেন। বৈদিক যুগে উপাসনার পদ্ধতি ছিল যজ্ঞ বা হোমভিত্তিক। তখনো মূর্তি বা বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে উপাসনা করা প্রচলিত হয়নি। ঋষিগণ দেবতাদের শক্তি স্মরণ করে মন্ত্রের মাধ্যমে উপাসনা করতেন এবং অগ্নি প্রজ্জ্বলন করে দেবতাকে আহ্বান করতেন।

ঋষিগণ বৈদিক দেবতাদের তিনটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করেছেন। যথা; ১. স্বর্গের দেবতা, ২. অন্তরিক্ষলোকের দেবতা এবং ৩. পৃথিবী বা মর্ত্যলোকের দেবতা।

স্বর্গের দেবতা: স্বর্গের দেবতাদের ক্ষমতাই শুধু বোঝা যায়। এ শ্রেণির দেবতারা মর্তে বা পৃথিবীতে আসেন না। তাঁরা অনেক দূরে অবস্থান করেন। এমন দেবতারা হলেন বিষ্ণু, সূর্য, বরুণ প্রমুখ।

অন্তরিক্ষলোকের দেবতা: অন্তরিক্ষলোকের দেবতাগণ স্বর্গ ও মর্ত্যলোকের মাঝখানে অবস্থান করেন। তাঁরা মর্ত্যে আসেন, কিন্তু থাকেন না। এরূপ দেবতারা হলেন ইন্দ্র, বায়ু, রুদ্র প্রমুখ।

মর্ত্যলোকের দেবতা: মর্ত্যের দেবতাদের দেখা যায়। তাঁরা পৃথিবীতে অবস্থানও করেন। এমন দেবতা হলেন অগ্নি, অপ্, সোম প্রমুখ। অগ্নির মাধ্যমে অন্য দেবতাদের মর্ত্যে আহ্বান করে আনা হয়।

আগুন জ্বালিয়ে বেদের মন্ত্র উচ্চারণ করে দেবতাকে আহ্বান জানানো এবং প্রার্থনা করাকে বলা হয় যজ্ঞ। যজ্ঞের সময় উচ্চারিত বেদের ছন্দবদ্ধ চরণগুলোকে বলা হয় মন্ত্র। এছাড়া রয়েছে গান।

বেদের কোনো-কোনো মন্ত্রে সুর আরোপ করে যজ্ঞের সময় গাওয়া হতো। এগুলোকে বলা হয় সাম। সাম মানে গান। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের বিভিন্ন প্রকার কথাও বেদে উল্লেখ করা হয়েছে।

দলীয় কাজঃ স্বর্গ, মর্ত্য ও অন্তরিক্ষলোকের দেব-দেবীদের একটি তালিকা তৈরি করো।

বেদ প্রথমে অবিভক্ত আকারেই ছিল। পরবর্তীকালে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদকে বিভক্ত করেন। এজন্য তাঁর এক নাম হয়েছে বেদব্যাস। তিনি বেদকে চারটি ভাগে ভাগ করেন। এগুলোকে বলা হয় সংহিতা। সংহিতা মানে সংগ্রহ বা সংকলন। সংহিতাগুলো হচ্ছে; ১. ঋগ্বেদ-সংহিতা ২. যজুর্বেদ-সংহিতা ৩. সামবেদ- সংহিতা এবং ৪. অথর্ববেদ-সংহিতা। সংহিতাগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে দেওয়া হলোঃ

ঋগ্‌বেদ-সংহিতা

ঋক্ শব্দের অর্থ স্তুতি। ঋক্‌গুলোকে মন্ত্রও বলা হয়। এই ঋক্ বা মন্ত্রগুলো হচ্ছে তিন বা চার পঙ্‌ক্তির ছোট ছোট কবিতা বা শ্লোক। এক সময়ে কবিতার মতো ঋগ্‌বেদের এই মন্ত্রগুলো আবৃত্তি করা হতো। সমস্ত ঋগ্‌বেদে এ-রকম ১০,৪৭২টি ঋক্ বা মন্ত্র রয়েছে। একই দেবতার উদ্দেশে রচিত মন্ত্রসমূহকে একত্রে বলা হয় সূক্ত। যেমন; ইন্দ্রসূক্ত।

সমস্ত ঋগ্‌বেদকে দশটি মণ্ডলে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি মণ্ডলে কয়েকটি সূক্ত এবং প্রতিটি সূক্তে কয়েকটি ঋক্ রয়েছে। ঋগ্‌বেদে মোট ১,০২৮টি সূক্ত রয়েছে। সূক্তগুলোতে দেবতাদের স্তুতি করা হয়েছে এবং তাঁদের কাছে সুখ ও শান্তির জন্য প্রার্থনা জানানো হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়– ইন্দ্র হচ্ছেন বৃষ্টি ও শিশিরের দেবতা। ইন্দ্রের প্রশংসা করে একটি ঋকে বলা হয়েছেঃ

ইন্দ্রং বয়ং মহাধন

ইন্দ্রমর্ভে হবামহে।

যুজং বৃত্রেষু বজ্রিণম্॥

(ঋগ্বেদ–১ম মণ্ডল, ৭ম সূক্ত, ৫ম ঋক্)

সরলার্থঃ ইন্দ্র আমাদের সহায়। শত্রুদের কাছে বজ্রধারী। আমরা অনেক সম্পদের জন্য কিংবা অল্প সম্পদের জন্যও ইন্দ্রকে আহ্বান করি।

এই মন্ত্রের দেবতা ইন্দ্র। ইন্দ্রকে নিজেদের সহায় এবং শত্রুদের কাছে শাস্তিদানকারী বজ্র নামক অস্ত্রধারী বলে স্তুতি করা হয়েছে এবং তাঁর কাছে ধনসম্পদ প্রার্থনা করা হয়েছে। এই ঋক্ মন্ত্রটির দ্রষ্টা হলেন ঋষি মধুচ্ছন্দা।

যজুর্বেদ-সংহিতা

‘যজুঃ’ মানে যজ্ঞের মন্ত্র। প্রাচীনকালের ঋষিরা বেদ থেকে মন্ত্র উচ্চারণ বা আবৃত্তি করে ধর্মানুষ্ঠান বা যাগযজ্ঞ করতেন। যজ্ঞ করার সময় উদ্দিষ্ট দেবতার জন্য সুনির্দিষ্ট মন্ত্র পাঠ করা হতো। এভাবে যজ্ঞে ব্যবহৃত মন্ত্রগুলো সংগ্রহ করে যে বেদে সংকলন করা হয়েছে তাকে যজুর্বেদ-সংহিতা বলা হয়। যজ্ঞানুষ্ঠানের নিয়ম-পদ্ধতি যজুর্বেদে সংকলিত হয়েছে। যজ্ঞকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বর্ষপঞ্জি বা ঋতু সম্পর্কিত ধারণা। বিভিন্নভাবে এবং বিভিন্ন সময়ব্যাপী যজ্ঞ করা হতো। কোনো যজ্ঞ ছিল দৈনন্দিন, কোনো যজ্ঞ ছিল সপ্তাহব্যাপী, কোনো যজ্ঞ ছিল পক্ষকালব্যাপী। আবার কোনো যজ্ঞ বর্ষব্যাপী, এমনকি দ্বাদশ-বর্ষব্যাপীও অনুষ্ঠিত হতো। একেক প্রকার যজ্ঞের জন্য একেক প্রকার বেদী নির্মাণ করা হতো। এই নির্মাণ-কৌশল থেকেই জ্যামিতি বা ভূমি পরিমাপ বিদ্যার উদ্ভব ঘটেছে।

ঋগ্বেদ ও সামবেদ পদ্যে রচিত। কিন্তু যজুর্বেদে গদ্য ও পদ্য উভয় রীতিই ব্যবহার করা হয়েছে। যজুর্বেদ দুটি প্রধান শাখায় বিভক্ত যথা; ১. কৃষ্ণযজুর্বেদ ও ২. শুক্লযজুর্বেদ। কৃষ্ণযজুর্বেদের অপর নাম তৈত্তিরীয়-সংহিতা। শুক্লযজুর্বেদের অপর নাম বাজসনেয়ী-সংহিতা। কৃষ্ণযজুর্বেদে ৭টি কাণ্ড ও ২১৮৪টি মন্ত্র রয়েছে। আর শুক্লযজুর্বেদে রয়েছে ৪০টি অধ্যায় এবং ১৯১৫টি মন্ত্র।

সামবেদ-সংহিতা

‘সাম’ শব্দের অর্থ গান। যজ্ঞ করার সময় কোনো কোনো ঋক্ বা মন্ত্র সুর করে গাওয়া হতো। এরূপ মন্ত্রগুলোকে বলা হয় সাম। যে বেদে এই সাম মন্ত্রসমূহ সংকলিত হয়েছে তাকে বলা হয় সামবেদ-সংহিতা। সামবেদ থেকে প্রাচীনকালের সংগীত সম্পর্কে জ্ঞানলাভ হয়। আমরা যে সুর করে গান গাই, তার অন্যতম আদি উৎস এই সামবেদ। ষড়জ, ঋষভ প্রভৃতি স্বরের (সরগম) উৎসও সামবেদ। প্রধানত ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলোকেই সুর দিয়ে গানের আকারে রূপদান করা হয়েছে। সামবেদ-সংহিতার মন্ত্রসংখ্যা ১৮১০টি। এগুলোর মধ্যে ৭৫টি ছাড়া বাকিগুলো ঋগ্বেদ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

অথর্ববেদ-সংহিতা

বেদের চতুর্থ ভাগ হচ্ছে অথর্ববেদ। অথর্ববেদ-সংহিতা আধ্যাত্মিক ও জাগতিক নানা প্রকার জ্ঞানের সংগ্রহ। অথর্ববেদের প্রাচীন নাম ‘অথর্বাঙ্গিরস’।‘অথর্ব’ বলতে ভেষজ বিদ্যা, শান্তি, পুষ্টি প্রভৃতি মঙ্গলক্রিয়া বোঝায়।‘আঙ্গিরস’ বলতে শত্রুবধ এবং বশীভূত করার উপায়, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি বোঝায়। প্রাচীনকালের চিকিৎসা পদ্ধতির আদি পরিচায়ক হিসেবে অথর্ববেদ বিখ্যাত। অথর্ববেদে নানা প্রকার ব্যাধির প্রতিকারের উপায়স্বরূপ নানা প্রকার বৃক্ষ, লতা, গুল্ম প্রভৃতি সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। আয়ুর্বেদ নামে পরিচিত চিকিৎসাশাস্ত্রের আদি উৎস এই অথর্ববেদ। এছাড়া এই বেদে অস্থিবিদ্যা ও শল্যবিদ্যারও (সার্জারি) উল্লেখ আছে।

২০২১

অথর্ববেদ-সংহিতা বিশটি কাণ্ড, ৭৩১টি সূক্ত এবং প্রায় ৬০০০ মন্ত্র নিয়ে রচিত। অথর্ববেদ গদ্য ও পদ্য উভয় রীতিতে রচিত। তবে পদ্যই বেশি। ছয় ভাগের এক ভাগমাত্র গদ্যে রচিত।

একক কাজ: ছকে প্রদত্ত প্রত্যেক প্রকার বেদের দুটি করে আলোচ্য বিষয় লেখো।	*ঋগ্বেদ*	*যজুর্বেদ*	*সামবেদ*	*অথর্ববেদ*

নতুন শব্দ: অন্তর্দৃষ্টি, অন্তরিক্ষলোক, দৃষ্ট, সূক্ত, শল্য, অথর্বাঙ্গিরস, ষড়জ, ঋষভ।

পাঠ ৩ : ধর্মাচরণে চতুর্বেদের প্রভাব

বেদ হিন্দুদের আদি এবং মূল ধর্মগ্রন্থ। সেদিক থেকে বৈদিক সাহিত্যের গুরুত্বও অসীম। এছাড়া প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের সমাজ ও ইতিহাসের পরিচয় পেতে হলেও বৈদিক সাহিত্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। সাহিত্য হিসেবেও বৈদিক সাহিত্য গুরুত্বপূর্ণ। ঋগ্‌বেদে দেবতাদের প্রশংসা করা হয়েছে। যজুর্বেদে যজ্ঞের বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া বেদ সমাজকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে সহায়তা করে। বেদ পাঠ করলে স্রষ্টা, বিশ্বপ্রকৃতি ও জীবন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ হয়। প্রত্যেকটি বেদের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। ঋগ্বেদ-সংহিতা পাঠ করলে আমরা বিভিন্ন বৈদিক দেব-দেবী সম্পর্কে জানতে পারি। অগ্নি, ইন্দ্র, উষা, রাত্রি, বায়ু প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির মাধ্যমে ঈশ্বরের অসীম ক্ষমতা উপলব্ধি করা যায়। তাঁদের কর্মচাঞ্চল্যকে আদর্শ করে জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।

যজুর্বেদ যজ্ঞের মন্ত্রের সংগ্রহ। এথেকে জানতে পারি সেকালে উপাসনার-পদ্ধতি কেমন ছিল। যজুর্বেদ অনুসরণে বিভিন্ন সময়ে যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে বর্ষপঞ্জি বা ঋতু সম্পর্কে ধারণা জন্মে। বিভিন্নভাবে এবং বিভিন্ন সময়ব্যাপী যজ্ঞানুষ্ঠান করা হতো। যজ্ঞের বেদী নির্মাণের কৌশল থেকেই জ্যামিতি বা ভূমি পরিমাপ বিদ্যার উদ্ভব ঘটেছে।

সামবেদ থেকে সেকালের গান ও রীতি সম্পর্কে জানতে পারি। জগতের প্রাচীন গানের অন্যতম উৎস সামবেদ। সামবেদ আমাদের মননশীলতাকে বাড়িয়ে দেয়। ফলে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে না।

অথর্ববেদ-সংহিতায় ইন্দ্রজাল, ব্যাধি নিরাময়, অনাবৃষ্টি রোধ, ভেষজবিদ্যা, শান্তি ও নানাবিধ শুভকর্ম সংক্রান্ত মন্ত্রাদি ও নির্দেশনা রয়েছে। জীবনকে সুন্দর ও সুস্থ রাখার উপায় হিসেবে ভেষজবিদ্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যা-ই ভেষজ তা-ই অমৃত। আর যা অমৃত তা-ই ব্রহ্ম। এই অথর্ববেদ হচ্ছে আয়ুর্বেদ বা চিকিৎসা বিজ্ঞানের মূল। এখানে নানা প্রকার রোগ-ব্যাধি এবং সেগুলোর প্রতিকারের উপায়স্বরূপ নানা প্রকার লতা, গুল্ম ও বৃক্ষাদির বর্ণনা করা হয়েছে।

সুতরাং সমগ্র বেদপাঠে পরমাত্মা, বৈদিক দেব-দেবী, যজ্ঞ, সংগীত, চিকিৎসাসহ নানা বিষয়ের জ্ঞান লাভ করে জীবনকে সুন্দর, সুস্থ ও পরিপাটি করে তোলা যায়। আর এজন্যই এগ্রন্থ আমাদের প্রত্যেকের পাঠ করা অবশ্যকর্তব্য।

একক কাজ: বেদের শিক্ষা তুমি কীভাবে জীবনাচরণে প্রয়োগ করবে তা ব্যাখ্যা করো।

নতুন শব্দ: কর্মচাঞ্চল্য, বর্ষপঞ্জি, স্বরূপ, গুল্ম।

পাঠ ৪ : শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার বিষয়বস্তু

মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত ২৫ থেকে ৪২ এই আঠারোটি অধ্যায় একত্রে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা, সংক্ষেপে গীতা নামে পরিচিত। এখানে সর্বমোট সাতশ শ্লোক আছে। এজন্য এর এক নাম সপ্তশতী। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যেসব উপদেশ দিয়েছিলেন তারই নাম শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা। ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু দুই ভাই। ধৃতরাষ্ট্র বড়, পাণ্ডু ছোট। কুরুবংশের নাম অনুসারে ধৃতরাষ্ট্রের সন্তানদের বলা হয় কৌরব। কিন্তু একই বংশের হয়েও পাণ্ডুর নাম অনুসারে তাঁর সন্তানদের বলা হয় পাণ্ডব। রাজ্য নিয়ে এই কুরু-পাণ্ডবের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে যায়। এ যুদ্ধে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের রথের সারথি হয়েছিলেন। রথ যখন দুপক্ষের সৈন্যদের মাঝখানে রাখা হলো, তখন অর্জুন স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে নিকটতম আত্মীয়-স্বজনকে দেখে মুষড়ে পড়লেন। তিনি তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন উপদেশ দেন। সেই উপদেশবাণীই শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় বর্ণিত হয়েছে। উপলক্ষ্য অর্জুন হলেও গীতায় ভগবান যে উপদেশ দিয়েছেন, তা সকল কালের সকল মানুষের জন্য। গীতা সকল উপনিষদের সারবস্তু অবলম্বনে রচিত জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তিযোগের এক অপূর্ব সমন্বয়। কেবল ধর্মগ্রন্থ হিসেবেই নয়, দার্শনিক গ্রন্থ হিসেবেও গীতা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। গীতা হিন্দুদের একখানা নিত্যপাঠ্য গ্রন্থ।

গীতাপাঠের কতগুলো নিয়ম আছে। প্রথমে গুরুকে প্রণাম করতে হয়। তারপর ইষ্ট দেবতাকে প্রণাম করতে হয়। এরপর বিষ্ণু, সরস্বতী, ব্যাস, ব্রহ্মা ও শিবকে প্রণাম করতে হয়। অতঃপর করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করে গীতা পাঠ করতে হয়।

২০২৫

গীতার মাহাত্ম্য অশেষ। গীতাপাঠ শেষে যথাসম্ভব সেই মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে হয়। গীতার মাহাত্ম্য সম্পর্কে অন্যতম শ্রেষ্ঠ শ্লোক এখানে উদ্ধৃত করা হলো:

সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥

সরলার্থ: সমস্ত উপনিষদ গাভীস্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণ দোহনকর্তা, অর্জুন বৎসস্বরূপ এবং গীতামৃত দুগ্ধস্বরূপ। সুধীজনেরা সেই অমৃত পান করেন।

একক কাজ: শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার বিষয়বস্তু লেখো।

নতুন শব্দ: কৌরব, পাণ্ডব।

পাঠ ৫ : শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় চতুর্বর্ণ, কর্তব্যপালন, সাম্য ও ভক্তি

চতুর্বর্ণ

ভগবান মানুষকে সমানভাবে সৃষ্টি করেছেন। তারপরও তাঁর সৃষ্টিতে সমাজে চারটি বর্ণ রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে – ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। ব্রহ্মজ্ঞানে জ্ঞানী ব্যক্তি হচ্ছেন ব্রাহ্মণ, যিনি সত্ত্বঃ গুণ দ্বারা প্রভাবিত। শাসক কিংবা যুদ্ধকারী সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি হচ্ছেন ক্ষত্রিয়, যিনি রজঃ গুণ দ্বারা প্রভাবিত। ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি হচ্ছেন বৈশ্য, যিনি রজঃ ও তমঃ গুণ দ্বারা প্রভাবিত। শ্রমজীবী সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি হচ্ছেন শূদ্র, যিনি তমঃ গুণ দ্বারা প্রভাবিত। এই যে বর্ণ বিভাজন, এটি কিন্তু জন্মভেদে নয়, কর্মভেদে। যে যেরকম কর্ম করে তার বর্ণটি সে অনুসারে হয়। এ প্রসঙ্গে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, **'চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ'** অর্থাৎ প্রকৃতির গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে আমিই চারটি বর্ণ সৃষ্টি করেছি। ব্রাহ্মণের সন্তান হলেই যে একজন ব্রাহ্মণ হবে এমনটি নয়। সত্ত্বঃগুণ-প্রভাবিত কোনো শূদ্রের সন্তানও ব্রাহ্মণ হতে পারে। আবার কোনো ব্রাহ্মণের সন্তান তমঃ গুণে প্রভাবিত হলে সে শূদ্র বলে গণ্য হবে। সুতরাং বলা যায়, জাতি বা বর্ণভেদ বংশগত নয়, গুণ ও কর্মগত।

কর্তব্যপালন

যা কিছু করা হয় তা ই কর্ম। আর যেসকল কর্ম করা আবশ্যক তা-ই কর্তব্যকর্ম। আর কর্তব্যকর্ম নিষ্পন্ন করাই কর্তব্যপালন। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় কর্তব্যপালনকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। আর এ কর্তব্যপালন করতে হবে নিষ্কামভাবে অর্থাৎ কোনো প্রকার ফলের আশা না করে। এ প্রসঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন:

কর্মে তব অধিকার কর্মফলে নয়,
ফল আশা ত্যাগ কর, কর্ম যেন রয় । (গীতা – ২/৪৭)

তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন, 'কর্ম অর্থাৎ কর্তব্যপালনই ধর্ম। তুমি ক্ষত্রিয়, যুদ্ধের মাঠে যুদ্ধ করাই তোমার ধর্ম। আসক্তিহীনভাবে যুদ্ধ করো তাহলে সুফল পাবে। তুমি যুদ্ধ না করলে তোমার ধর্ম নষ্ট হবে । কেননা স্ব-স্ব কর্ম সম্পাদন করাই ধর্ম ।'

স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি ।
ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥ (গীতা – ২/৩১)

তোমার নিজের কুলগত ধর্মের দিক বিচার করলেও মৃত্যুভয়ে তোমার বিচলিত হওয়া উচিত নয় । কারণ ধর্মযুদ্ধ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অধিক মঙ্গলজনক আর কিছু নেই ।

সুতরাং আমাদের কাজগুলো সঠিকভাবে সম্পাদন করাই আমাদের প্রকৃত ধর্ম । যেমন; **'ছাত্রাণাম্ অধ্যয়নং তপঃ' –** ছাত্রদের অধ্যয়ন করাই হচ্ছে তাদের তপস্যা বা কর্তব্য ।

সাম্য

সাম্য বা সমত্ব মানে সমান । সকলকে সমান দেখার নাম সাম্যচেতনা । সকল জীবের মধ্যে ঈশ্বর সমানভাবে বিরাজমান । সুতরাং সকল জীবকে এই যে সমতার দৃষ্টিতে দেখা এবং সমতাপূর্ণ আচরণ করা এরই নাম সাম্যবোধ । শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে, সর্ববিষয়ে সকলের প্রতি যাঁর আচরণ সমতাপূর্ণ, তিনিই শ্রেষ্ঠ (৬/৯) । সমদর্শী সর্বভূতে আত্মাকে দেখেন এবং আত্মায় সর্বভূতকে দেখেন (৬/২৯) । এর অর্থ হলো, সমদর্শী সকল জীবকে নিজের মতো মনে করেন এবং নিজেকে সকলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেন । সুতরাং আমরাও সকলকে সমদৃষ্টিতে দেখব । শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা থেকে আমরা সাম্য সম্পর্কে এ শিক্ষাই পাই ।

ভক্তি

ভগবানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা বা ভালোবাসাকে ভক্তি বলা হয়। ভক্ত ভগবানের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে তাঁর সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করেন। তাই বলা হয় যে – ভক্তি হচ্ছে ভক্ত ও ভগবানের মধ্যকার মিলনসেতু। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় বলা হয়েছে – ভক্ত কামনা-বাসনামুক্ত হবেন। তাঁর সমস্ত কর্মের ফল ঈশ্বরের উদ্দেশে নিবেদন করবেন। যিনি এভাবে ভগবানে আত্মনিবেদন করেন, তাঁর অন্তরে ভক্তি জন্মে এবং ভক্তিতেই মুক্তিলাভ হয়।

একক কাজ: কর্ম, সাম্য ও ভক্তি সম্পর্কে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার শিক্ষার প্রভাব সম্পর্কে লেখো।

নতুন শব্দ: সত্ত্বঃ, রজঃ, তমঃ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, আসক্তি, তপঃ, সাম্য, সমদর্শন।

পাঠ ৬ : জীবনাচরণ ও চরিত্র গঠনে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার শিক্ষা

গীতা আমাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার প্রেরণা দেয়। কারণ স্বয়ং ভগবানই যুগে-যুগে দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন এবং ধর্ম রক্ষার জন্য পৃথিবীতে অবতাররূপে নেমে আসেন। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন:

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্‌॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্‌।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ (গীতা – ৪/৭-৮)

অর্থাৎ, যখনই ধর্মের অধঃপতন হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান ঘটে, তখনই সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্ট লোকদের বিনাশ এবং ধর্ম সংস্থাপন করার জন্য আমি এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হই।

গীতায় বলা হয়েছে – আত্মার ধ্বংস নেই; দেহের ধ্বংস হলে সে আবার নতুন দেহ ধারণ করে।

গীতার এই শিক্ষা আমাদের মৃত্যুকে ভয় না করে ভালো কাজে এগিয়ে যাওয়ার সাহস জোগায়।

গীতায় আরো বলা হয়েছে – ১. শ্রদ্ধাবান ও সংযমী ব্যক্তিই জ্ঞানলাভে সমর্থ হন, ২. অনাসক্ত কর্মযোগী মোক্ষ লাভ করেন, ৩. জ্ঞানী ভক্তই ঈশ্বরকে হৃদয়ে অনুভব করেন এবং ৪. এই বিশাল বিশ্বে যাকিছু আছে সবই ঈশ্বরের মধ্যে বিদ্যমান।

গীতার এই কথা থেকে আমরা শ্রদ্ধা ও সংযম সাধনার প্রতি মনোনিবেশ করতে পারি । জাগতিক বিষয়ের প্রতি নির্মোহ হওয়ার প্রেরণা পাই । ধর্ম অনুশীলনের কাজে প্রবৃত্ত হই, অর্থাৎ অর্থহীন গতানুগতিক পথ পরিহার করে ঐশ্বরিক তত্ত্বের মর্মার্থ বোঝার চেষ্টা করি । সবকিছু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্গত । সর্বপ্রকার ভেদবুদ্ধি দূর করে সকলকে ভালোবাসতে চেষ্টা করি । যে যেভাবে বা যে পথে ঈশ্বরকে ডাকতে চায় ডাকতে পারে । ঈশ্বর সেভাবেই তার ডাকে সাড়া দেন । এটাই হচ্ছে সর্বধর্ম সমন্বয়ের মর্মবাণী ।

গীতায় জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমন্বয় করা হয়েছে । জ্ঞানের আলোকে মনকে আলোকিত করতে হবে । তার জন্য কর্ম করতে হবে । এ কর্ম হবে নিষ্কাম । আর সমস্ত নিষ্কাম কর্মের ফল ভগবানে সমর্পণ করতে হবে । একেই বলে ভক্তি । এ তিনের সমন্বয়ে জীবনপথে চলতে হবে । সুতরাং গীতায় বাস্তব জীবনে কীভাবে চলতে হবে সেই পথও দেখানো হয়েছে । সামগ্রিক বিচারে আমাদের জীবনাচরণে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার গুরুত্ব অপরিসীম ।

একক কাজ : শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার শিক্ষা সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখো ।

নতুন শব্দ : অভ্যুত্থান, শ্রদ্ধাবান, সংযমী, অনাসক্ত, কর্মযোগী, মোক্ষ ।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১। বেদাঙ্গের অঙ্গাদ কোনটি?

ক. আরণ্যক

খ. অলংকার

গ. ব্যাকরণ

ঘ. উপনিষদ

২। আমাদের আদি ধর্মগ্রন্থ পাঠ করলে কী লাভ হয়?

ক. ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায়

খ. জগৎ সম্পর্কে ধারণা লাভ হয়

গ. গভীর আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভ হয়

ঘ. বিভিন্ন মন্ত্রের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জানা যায়

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

ধর্মপ্রাণ সিমারানি দেবদেবীগণের পূজা করার নিয়ম সম্পর্কে জানার জন্য প্রতিদিন একটি বেদের একটি খন্ড পাঠ করেন এবং তা অনুশীলন করেন। কিছুদিন যাবৎ তাঁর বাতের ব্যথা শুরু হয়েছে। অনেক চিকিৎসার পরও উপশম হচ্ছে না বিধায় গ্রামের আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক জিতেন বাবুর শরণাপন্ন হন। তাঁর গৃহে তিনি বেদের অন্য একটি খন্ডের বই দেখতে পান।

৪। সিমারানির পঠিত বইটি বেদের কোন ভাগের অন্তর্গত?

ক. ঋগ্বেদ

খ. সামবেদ

গ. যজুর্বেদ

ঘ. অথর্ববেদ

৫। জিতেনবাবুর বাড়িতে বেদের যে খন্ডটি রয়েছে তার বিষয়বস্তু হলো-

i. রোগব্যাধি হতে উপশম প্রক্রিয়া

ii. নানা প্রকার লতা, গুল্ম ও বৃক্ষাদির বর্ণনা

iii. শান্তি ও নানাবিধ শুভকর্মসংক্রান্ত নির্দেশনা ।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i , ii ও iii

২০২৬

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

স্কুল শিক্ষক পুলিন বাবু অত্যন্ত নীতিমান ও ধার্মিক মানুষ। তিনি প্রতিদিন সকালে এক দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানান। প্রতিবছর একবার বড় করে এ পূজা করেন। তিনি শিক্ষার্থীদের যথাযথভাবে শিক্ষা দান করেন। তবে শিক্ষার্থীরা প্রতিষ্ঠিত হয়ে তাকে কিছু দেবে এরূপ প্রত্যাশা তার নেই। তিনি অনুভব করেন সংসারে নিঃস্বার্থভাবে দায়িত্ব পালন করাই তার প্রকৃত ধর্ম।

ক. ষড়ঙ্গ কাকে বলে?

খ. কাকে অপৌরুষেয় বলা হয়েছে? কেন?

গ. পুলিন বাবু যে দেবতার পূজা করেন তা কোন বৈদিক দেবতার অন্তর্গত? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. পুলিন বাবুর আচরণে যে ধর্মগ্রন্থের প্রভাব রয়েছে পাঠ্যপুস্তকের আলোকে তা মূল্যায়ন করো।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. ইন্দ্র কোন ধরনের দেবতা তা ব্যাখ্যা করো।

২. ‘ভক্তিতেই মুক্তি’–ব্যা খ্যা করো।

৩. ভূমি পরিমাপ বিদ্যা কোন বেদের আলোচ্য বিষয় তা ব্যাখ্যা করো।

তৃতীয় অধ্যায়

হিন্দুধর্মের স্বরূপ ও বিশ্বাস

সংস্কৃত ধৃ ধাতুর সঙ্গে মন্ প্রত্যয় যোগে ধর্ম শব্দটি গঠিত হয়েছে। এর অর্থ যা ধারণশক্তি-সম্পন্ন তা-ই ধর্ম। হিংসা নাকরা, চুরি না-করা, সত্যনিষ্ঠ হওয়া, দেহ-মনে পবিত্র থাকা এবং সংযমী হওয়া এ পাঁচটি গুণ হিন্দুধর্মের সাধারণ লক্ষণ। আবার ধর্ম-অধর্ম নির্ণয়ে পবিত্র বেদ, স্মৃতিশাস্ত্র, সদ্ব্যক্তিদের আচার-আচরণ বিবেকের নির্দেশ–এই চারটি হচ্ছে হিন্দুধর্মের বিশেষ লক্ষণ। বহু যুগের বহু সাধকের সাধনায় এ ধর্ম ক্রমশ বিকশিত হয়েছে। হিন্দুধর্ম বহুকালের প্রাচীন। চলার পথে মাঝেমাঝে নতুন ধর্মীয় চিন্তা এতে যুক্ত হয়েছে। এ ধর্মের বিধি-বিধান অনুশীলন করে জীবনকে সুন্দর ও শান্তিময় করা যায়।

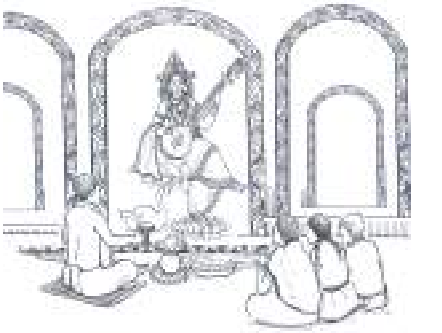

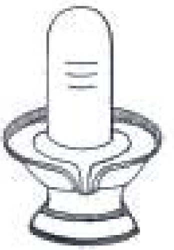

সমাজ-জীবনে কর্ম বা জীবিকা অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র–এ চতুর্বর্ণের সৃষ্টি হয়েছে। এ বর্ণভেদ পেশাগত, জন্মগত নয়। মানুষের পূর্ণাঙ্গ জীবনকাল ধরা হয় শতবর্ষ। পুরো সময়টিকে চার ভাগে ভাগ করা হয় যথা: ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। একত্রে এদের বলা হয় চতুরাশ্রম।

হিন্দুধর্মে যুগবিভাগ রয়েছে- হিন্দুধর্ম অনুসারে যুগ চারটি। যথা: সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। প্রতিটি যুগের জন্য নির্দিষ্ট ধর্মকর্মের কথা বলা হয়েছে, যেগুলোকে বলা হয় যুগধর্ম। পবিত্র দেহ-মন নিয়ে ধর্মচর্চা করতে হয়। এজন্য পূজা, উপবাস, প্রার্থনা, উপাসনা ইত্যাদি আচার-অনুষ্ঠানের অনুশীলন করতে হয়। হিন্দুধর্মে ব্রত পালনের ব্যবস্থা রয়েছে। ভক্তগণ ব্রত পালন করে পাপমুক্ত হয়ে থাকেন। ঈশ্বরে বিশ্বাস, পূজা-পার্বণ ও ব্রতপালনের মধ্য দিয়ে ধর্মের সুফল পাওয়া যায়।

আমরা এ অধ্যায়ে দুটি পরিচ্ছেদের প্রথম পরিচ্ছেদে হিন্দুধর্মের সাধারণ ও বিশেষ লক্ষণ এবং হিন্দুধর্মের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে অবগত হব। আর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণ ও আশ্রমধর্মের ধারণা, বর্ণভেদ জন্মগত নয়, পেশাগত– এ ধারণা, যুগধর্ম, ব্রতপালন, ব্রতপালনে করণীয়, শিবরাত্রির ব্রতকথা এবং ব্রতপালনের গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত হব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- হিন্দুধর্মের সাধারণ ও বিশেষ লক্ষণসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- হিন্দুধর্মের ক্রমবিকাশ সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করতে পারব;
- জীবনাচরণে হিন্দুধর্মের সাধারণ ও বিশেষ লক্ষণের প্রকাশ ঘটাতে পারব;
- বর্ণ ও আশ্রমের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বর্ণ ও আশ্রমধর্মের বর্ণনা করতে পারব;
- বর্ণভেদ পেশাগত, জন্মগত নয়– তা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- যুগধর্মের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ব্রতপালনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- শিবরাত্রির ব্রতকথা বর্ণনা করতে পারব;
- ব্রত, ব্রতপালনে করণীয় ও ব্রতপালনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বর্ণে-বর্ণে কোনো ভেদ নেই তা উপলব্ধি করে নিজ আচরণে তার প্রকাশ ঘটাতে পারব;
- ব্রতপালনের গুরুত্ব সম্পর্কে জেনে ব্রতপালনে উদ্বুদ্ধ হব ।

প্রথম পরিচ্ছেদ

হিন্দুধর্মের স্বরূপ

হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে ধর্মের লক্ষণসমূহকে সাধারণ লক্ষণ ও বিশেষ লক্ষণ–এ দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

পাঠ ১ : সাধারণ লক্ষণ

সংস্কৃত ধৃ-ধাতুর সঙ্গে মন্ প্রত্যয়যোগে ধর্ম শব্দটি উৎপন্ন হয়েছে। ধৃ-ধাতুর অর্থ 'ধারণ করা'। তাহলে ধর্ম শব্দটিতে বোঝাচ্ছে ধারণশক্তি। এ প্রসঙ্গে মহাভারতের শান্তিপর্বে বর্ণিত ধর্মের লক্ষণ বিষয়ক শ্লোকটি স্মরণ করা যায়:

ধারণাদ্ ধর্মম্ ইত্যাহুর্ধর্মেণ বিধৃতাঃ প্রজাঃ।
যঃ স্যাদ্ ধারণসংযুক্তঃ স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ॥ (১০৬/১৪)

অর্থাৎ, ধারণ ক্রিয়া (ধৃ+মন্) থেকে ধর্ম শব্দের উৎপত্তি। ধর্ম সৃষ্টিকে বিশেষভাবে ধারণ করে আছে। সংক্ষেপে যা-কিছু ধারণশক্তি-সম্পন্ন তা-ই ধর্ম। যেমন–মানুষের ধর্ম হচ্ছে মনুষ্যত্ব। এই মনুষ্যত্বই মানুষকে অন্যান্য প্রাণী থেকে আলাদা করে রেখেছে। এই মনুষ্যত্বের পরিচয় দিতে গিয়ে মনুসংহিতা নামক স্মৃতিশাস্ত্রে বলা হয়েছে:

অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচম্ ইন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
এতং সামাসিকং ধর্মং চাতুর্বর্ণেঽব্রবীন্মনুঃ॥ (১০/৬৩)

অর্থাৎ, হিংসা না-করা, সত্যবাদী হওয়া, চুরি না-করা, পবিত্র থাকা এবং সংযমী হওয়া এই পাঁচটিকে চতুর্বর্ণের জন্য মনুষ্যত্ব বা ধর্মের সাধারণ লক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ গুণগুলো অর্জন করে একজন মানুষ মনুষ্যত্বের অধিকারী হতে পারে। যদি দেখা যায় একজন মানুষ অন্যকে হিংসা করেন না, জীবনে সত্যকে ধরে রেখেছেন, অপরের সম্পদ চুরি করেন না, পোশাক-পরিচ্ছদ ও চিন্তা-ভাবনায় পরিশুদ্ধ এবং জীবন ধারণের প্রতিটি ক্ষেত্রে সংযমী, তাহলে ঐ ব্যক্তিকে আমরা মনুষ্যত্বের অধিকারী বলব। আর এরূপ ব্যক্তিই হবেন হিন্দুধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে আদর্শ মানুষ। তাই এগুলোকে হিন্দুধর্মের সাধারণ লক্ষণ বলা হয়েছে। ধর্ম ধার্মিককে রক্ষা করে। ধর্ম নষ্ট হলে মানুষ আর মানুষ থাকে না।

একক কাজ: ধর্মের সাধারণ লক্ষণ তোমার বাস্তব জীবনে কীভাবে প্রয়োগ করবে তা লেখো।

নতুন শব্দ: সংযমী, স্মরণ, মনুষ্যত্ব।

পাঠ ২ : বিশেষ লক্ষণ

ধর্মের সাধারণ লক্ষণ বর্ণনার পর ধর্মের বিশেষ লক্ষণসমূহ বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে মনুসংহিতা নামক স্মৃতিশাস্ত্রে বলা হয়েছে:

বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাৎ ধর্মস্য লক্ষণম্॥ (২/১২)

অর্থাৎ, বেদ, স্মৃতিশাস্ত্র, সদাচার ও বিবেকের বাণী– এই চারটি ধর্মের বিশেষ লক্ষণ। এই চারটিকে অনুসরণ করে কোনটা ধর্ম, কোনটা অধর্ম তা নির্ণয় করা যায়।

বেদ

সনাতন ধর্মের ভিত্তিমূলে রয়েছে বেদ। বেদ আদি ধর্মগ্রন্থ। 'বেদ' শব্দের অর্থ জ্ঞান। বেদের ঋষিগণ ধ্যানস্থ হয়ে ঈশ্বরের বাণী লাভ করেছেন। সেবাণীসমূহ কালক্রমে লিপিবদ্ধ হয়ে বেদ নামে পরিচিত হয়েছে। আমরা জানি বেদ চারটি–ঋগ্‌বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ। কোনটা ধর্ম, কোনটা অধর্ম এর মীমাংসার জন্য বেদের মতকেই গ্রহণ করা হয়।

স্মৃতিশাস্ত্র

বেদের পরে সব রকম কর্তব্যকর্মের উপদেশ দিয়ে রচিত হয় স্মৃতিশাস্ত্র। স্মৃতিশাস্ত্রগুলো রচিত হয়েছে বেদের মতামত ঠিক রেখে। স্মৃতিশাস্ত্রের নিয়ম-নির্দেশ মেনে চললে ধর্মাধর্ম নির্ণয় করা সহজ হয়।

সদাচার

সৎ+আচার = সদাচার। সৎ ব্যক্তিদের আচার-আচরণে ধর্মের প্রকাশ ঘটে। বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রের মাধ্যমে যদি ধর্ম ও অধর্ম নির্ণয় করা সম্ভব না হয়, সে ক্ষেত্রে সমাজে মহাপুরুষদের আচার-আচরণ ও উপদেশ-নির্দেশ অনুসরণ করাই ধর্ম।

বিবেকের বাণী

পূর্বে আলোচিত বেদ, স্মৃতিশাস্ত্র ও সদাচার অনুসরণ করেও যদি বিশেষ কোনো পরিস্থিতিতে ধর্ম-অধর্ম নির্ণয় করা সম্ভব না হয়, সেক্ষেত্রে মানুষকে তার বিবেকের আশ্রয় নিতে হয়। মানুষ বিবেকবান প্রাণী। তাই তাকে বিবেকবুদ্ধি অবলম্বন করে জীবনপথে চলতে হয়। সর্বক্ষেত্রে ধর্মের নির্দেশ মেনে চলা মঙ্গলজনক নাও হতে পারে। যেমন; শাস্ত্রের নির্দেশ হচ্ছে সত্য বলা ধর্ম, আর মিথ্যা বলা পাপ। এ নির্দেশ সকল ক্ষেত্রে অনুসরণ করা সম্ভব নাও হতে পারে। মিথ্যা বললে যদি একজন নির্দোষ মানুষের জীবন রক্ষা পায়, তাহলে মিথ্যা বলাই ধর্ম। এরূপ ক্ষেত্রে সত্য বলা ধর্ম নয়। এমন জটিল পরিস্থিতিতে মানুষের অন্তরে অবস্থিত ঈশ্বর বা বিবেকের নির্দেশ নিয়ে ধর্মাধর্ম নির্ণয় করতে হয়।

পাঠ ৩ : হিন্দুধর্মের ক্রমবিকাশ

ভারতবর্ষে মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গেসঙ্গে সনাতন তথা হিন্দুধর্মের বিকাশ শুরু হয়েছে। চিন্তাশীল মুনি-ঋষিগণ মানুষের কল্যাণ চিন্তায়, ধর্মীয় আচার-আচরণে এমনকি পারমার্থিক চিন্তায় নতুননতুন ধর্মীয় ভাব প্রবর্তন করেছেন। বৈদিক যুগে ধর্ম-কর্ম পালিত হতো যজ্ঞকর্মরূপে। যজ্ঞক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তখন দেবতাদের আরাধনা করা হতো। যজ্ঞকর্মের ফলে স্বর্গপ্রাপ্তি হতো, কিন্তু মানুষের মুক্তিলাভ হতো না। তাই বেদের পরে উপনিষদের যুগে মুক্তির চিন্তা প্রাধান্য পায়। মানুষ মুক্তিলাভের জন্য এক ব্রহ্মের আরাধনা করতে থাকে। এ সময় সমাজ-সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণের প্রবণতা দেখা দেয়। কালক্রমে এ চিন্তার মধ্যেও মানুষ যেন সন্তুষ্ট হতে পারল না। এ অবস্থায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটে। তখন ছিল দ্বাপর যুগ। সমাজ-জীবনে সন্ন্যাসের পরিবর্তে কর্মের দিকে মোড় ফেরানো হলো। তিনি ব্যাখ্যা করে বললেন, কর্মত্যাগ নয়, কর্ম করতে হবে ভোগের আকাঙ্ক্ষা বাদ দিয়ে। মনে করতে হবে সমস্ত জগৎ ভগবানের কর্মক্ষেত্র। এখানে মানুষ ভগবানেরই কর্ম করে যাচ্ছে এবং কর্মের ফলও ভগবানেরই প্রাপ্য। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় এই নিষ্কাম কর্মযোগের বিষয়টি বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরা হয়েছে। কর্মযোগ অনুশীলন করে মানুষ মুক্তিলাভ করতে পারে।

এরপর আসে ভক্তিবাদের কথা। মানুষ ভক্তিভরে ঈশ্বরকে সাকারে উপাসনা করতে থাকে। বহু দেব-দেবীর পূজা-পার্বণ হিন্দু সমাজে প্রচলিত হয়। এর ফলে অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন দেব-দেবীর উপাসকগণ ভিন্ন-ভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে পড়েন, যেমন; শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব ইত্যাদি। এই সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে অসহিষ্ণু ভাব দেখা দেয়। এরূপ অবস্থায় শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব ঘটে। তিনি প্রেমভক্তিমূলক বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন। এ ধর্মের প্রধান লক্ষ্য ভক্তির মাধ্যমে ভগবানের আরাধনা করা, সমাজে বর্ণভেদ দূর করা ও শান্তি স্থাপন করা।

২০২৬

উনবিংশ শতকে হিন্দুধর্মের অনেক আচার-আচরণে সংস্কার সাধন করা হয়। মূর্তিপূজার পরিবর্তে আসে এক ব্রহ্মচিন্তা। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে রাজা রামমোহন রায়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয় ব্রাহ্মসমাজ। অপরদিকে মূর্তিপূজার মাধ্যমেও যে মানুষ ঈশ্বরলাভ করতে পারে, এ ধারণাটি শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের প্রচেষ্টায় হিন্দুধর্মে পুরাতন ও নতুন চিন্তাধারার সমন্বয় ঘটে। সংক্ষেপে বলা যায়, হিন্দুধর্মের বিকাশ ঘটেছে বৈদিক যুগে যজ্ঞকর্মে, বেদান্তের ব্রহ্মসাধনায়, পৌরাণিক যুগে দেব-দেবীর উপাসনায়, দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণের কর্মযোগে, মধ্যযুগে শ্রীচৈতন্যের ভক্তিভাবনায়, আর আধুনিক কালে শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্ম সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে।

ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। তাঁর ভাব অনন্ত। তাঁকে পাওয়ার পথও বিচিত্র। সাধনপথে যেকোনো প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে। মনে রাখতে হবে, মানবের কল্যাণের জন্যই ধর্ম এসেছে। ধর্মাচরণে মানব কল্যাণকে অবশ্যই প্রাধান্য দিতে হবে। মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর রয়েছেন, তাই মানবসেবাই ঈশ্বরসেবা। এই ধর্মবোধে বিশ্বাসী হয়ে আমরা জীবনে সেবাধর্মের অনুশীলন করব এবং মানবতাবোধ জাগ্রত করতে যত্নবান হব।

দলীয় কাজ: ধর্মের বিশেষ লক্ষণসমূহ তোমাকে মানবতাবোধে কীভাবে উদ্বুদ্ধ করছে এ সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখো।

নতুন শব্দ: স্মৃতিশাস্ত্র, সদাচার, ব্রাহ্মসমাজ, বেদান্ত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হিন্দুধর্মের বিশ্বাস

পাঠ ১ : বর্ণভেদ

আমরা হিন্দুধর্মের সাধারণ ও বিশেষ লক্ষণ এবং ক্রমবিকাশ সম্পর্কে জেনেছি। এখন হিন্দুধর্মে বর্ণপ্রথা সম্পর্কে অবগত হব।

হিন্দুধর্মের মূল ধর্মগ্রন্থ বেদ। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চার বর্ণের কথা বেদ থেকেই জানা যায়। সমাজে সকল মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি ও কর্মদক্ষতা সমান নয়। কর্মের যোগ্যতা অনুসারে প্রাচীনকাল থেকেই এ ধর্মে বর্ণবিভাগ রয়েছে। সমাজে যাঁরা জ্ঞান-বুদ্ধিতে উন্নত তাঁরা ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হন। তাঁরা জ্ঞান অর্জন, জ্ঞান বিতরণ এবং ধর্মকর্মে নিযুক্ত থাকতেন। আবার রাজকার্যে কুশলী, দেশরক্ষার কাজে দক্ষ এই শ্রেণির লোকদের বলা হয় ক্ষত্রিয়। ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা এবং শস্যাদি উৎপাদন কর্মে উৎসাহী ব্যক্তিরা হলেন বৈশ্য। আর শ্রমজীবী ব্যক্তিদের শূদ্র শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

বর্ণভেদ পেশাগত, জন্মগত নয়

বৈদিক যুগে বর্ণপ্রথা ছিল কর্ম বা পেশাগত। ঋগ্‌বেদের একটি মন্ত্রে একজন ঋষি বলছেন, আমি বেদমন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। আমার কন্যা যব ভেজে ছাতু বানিয়ে বিক্রি করে। আর আমার ছেলে চিকিৎসক। এ থেকে বোঝা যায়, তখন বর্ণভেদ জন্মগত বা বংশানুক্রমিক ছিল না। তাছাড়া ক্ষত্রিয় রাজা বিশ্বামিত্র তপস্যার বলে ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করেছিলেন। বৈশ্য থেকে ব্রাহ্মণ হওয়ারও দৃষ্টান্ত ধর্মগ্রন্থে রয়েছে। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায়ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে তিনি চার বর্ণের সৃষ্টি করেছেন (গীতা– ৪/১৩)। কিন্তু কালক্রমে এই বর্ণপ্রথা জন্মগত হয়ে দাঁড়ায়। তাই ব্রাহ্মণের সন্তান হয় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের সন্তান হয় ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের সন্তান হয় বৈশ্য এবং শূদ্রের সন্তান হয় শূদ্র। এজন্য একই পরিবারের চার সন্তান চার রকম গুণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করলেও জন্মগত কারণে চারজনকেই একই কর্ম করতে হয়। ফলে তারা কোনো কর্মেই দক্ষতা অর্জন করতে পারে না। তাই আধুনিক কালে হিন্দুধর্মের বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেছেন–এই বর্ণবিন্যাস হবে পূর্বের ন্যায় কর্মের ভিত্তিতে, অর্থাৎ বর্ণভেদ পেশাগত, জন্মগত নয়। বংশানুক্রমিক বর্ণভেদ প্রথা হিন্দুধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের প্রতিকূল। তাই সমাজের পরিবর্তনশীলতায় এ প্রথার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। অনেক ক্ষেত্রেই সমাজের সচেতন পরিবারগুলো এ প্রথার গোঁড়ামির প্রতিকূলে অবস্থান নিয়ে পারিবারিক কাজ সম্পাদন করছে। পেশাগত বর্ণভেদের মূল লক্ষ্য ছিল পেশার উৎকর্ষ সাধন ও নৈতিক গুণাবলির বিকাশের মাধ্যমে সামাজিক মঙ্গল সাধন করা। বংশানুক্রমিক বর্ণভেদ সমাজের সচেতন মানুষের নিকট কুসংস্কার ব্যতীত অন্য কিছু নয়। তাই এ দৃষ্টিভঙ্গির আরও পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়।

একক কাজ: 'হিন্দুধর্মে বর্ণভেদ প্রথা ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের প্রতিকূল'—এ সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখো।

নতুন শব্দ: বর্ণভেদ, কুশলী, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র।

২০২৬

পাঠ ২ : আশ্রমধর্ম ও যুগধর্ম

আশ্রমধর্ম

আশ্রমধর্ম হিন্দু সমাজের একটি বিশেষ দিক। প্রাচীনকালে ঋষিগণ মানবজীবনকে চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করে দেখেছেন যেমন; ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। এই চারটিকে একত্রে বলা হয় চতুরাশ্রম। মানুষের আয়ুষ্কাল মোটামুটি একশ বছর ধরে পঁচিশ বছর করে সমান চার ভাগে ভাগ করা হয়। এক থেকে পঁচিশ বছরকে বলা হয় ব্রহ্মচর্য আশ্রম। এ সময় গুরুগৃহে থেকে বিদ্যা অর্জন করতে হয়। দ্বিতীয় পর্যায় ছাব্বিশ থেকে পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত গার্হস্থ্য জীবন। এ সময় ব্রহ্মচারী গুরুগৃহ থেকে নিজগৃহে ফিরে বিবাহ সম্পন্ন করে সংসারধর্ম পালন করে। পঞ্চাশ বছর অতিক্রান্ত হলে সংসার ত্যাগ করে ধর্মানুশীলনের জন্য বনে যেতে হয়। এটি চলে একান্ন থেকে পঁচাত্তর বছর পর্যন্ত। এ পর্যায়কে বলা হয় বানপ্রস্থ আশ্রম। শেষ পঁচিশ বছর অর্থাৎ, ছিয়াত্তর থেকে একশত বছর পর্যন্ত হচ্ছে সন্ন্যাস আশ্রম। এ সময় মানুষ তীর্থেতীর্থে ঘুরে বেড়ায় এবং ঈশ্বর চিন্তা করে। এই চারটি স্তরে নির্ধারিত কর্মই হচ্ছে আশ্রমধর্ম বা চতুরাশ্রম।

নতুন শব্দ: ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস, চতুরাশ্রম, আয়ুষ্কাল।

যুগধর্ম

হিন্দুধর্মের মতে যুগ হচ্ছে চারটি যথা: সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। মানবসভ্যতা বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়কে ধরা হয় সত্যযুগ। এ যুগে মানুষ ছিল ধর্মপ্রাণ। তাদের জীবন ছিল সৎকর্মময়। তখন ধর্ম ছিল পূর্ণ, ষোল আনা। এরপরে আসে ত্রেতাযুগ। এ সময়ে মানবসমাজে কিছুকিছু অসত্য এবং পাপের প্রকাশ ঘটে। তখন সমাজে ছিল এক ভাগ পাপ আর তিন ভাগ ধর্ম। সমাজে ধর্ম ও নৈতিকতার প্রভাব তখনো বেশি থাকায় অধর্ম দুর্বল হয়ে থাকে।

পরবর্তী যুগকে বলা হয় দ্বাপরযুগ। এ সময়ে ধর্মের প্রভাব আরো দুর্বল হয়ে পড়ে। অপরদিকে পাপ, অন্যায়, অত্যাচার বেড়ে যায়। এ সময় ধর্ম ও অধর্ম সমান-সমান হয়ে যায়। এ-সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়ে সমাজের দুষ্কৃতিকারীদের বিনাশ, সৎ ব্যক্তিদের দুঃখ মোচন এবং ধর্ম সংস্থাপন করেন।

এরপর আসে কলিযুগ। এ-সময়ে ধর্মের অবস্থা আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। অপরদিকে অধর্ম তথা পাপকর্মের বৃদ্ধি ঘটে। মানুষের ধর্মবোধ হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। এ অবস্থায় আবির্ভূত হন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। তাঁর প্রচেষ্টায় সমাজে প্রেমভক্তির প্রবাহ সৃষ্টি হয়। সমাজ-জীবনে স্বস্তি ফিরে আসে।

চার যুগের আচরণের জন্য শাস্ত্রে ধর্ম-কর্মের নির্দেশ রয়েছে। তাকে বলা হয় যুগধর্ম শাস্ত্রমতে-

তপঃ পরং সত্যযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুর্দানমেকং কলৌ যুগে॥

অর্থাৎ, সত্যযুগে তপস্যা ছিল প্রধান ধর্ম, ত্রেতাযুগে জ্ঞান, দ্বাপরে যজ্ঞ এবং কলিযুগে দান।

একক কাজ: যুগধর্ম আনুযায়ী চার যুগের বৈশিষ্ট্যসমূহ লেখো।

নতুন শব্দ: সৎকর্মময়, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, ত্রেতা, দ্বাপর।

২০২৬

পাঠ ৩ : ব্রত ও ব্রতপালনে করণীয়

হিন্দুদের ধর্মচর্চার ক্ষেত্রে পূজা, উপাসনা, পার্বণ ও ব্রত পালনের বিধান রয়েছে। পুণ্য অর্জন ও পাপ হতে মুক্তির ইচ্ছায় অনুষ্ঠিত ধর্মকর্মকেই ব্রত বলে। অর্থাৎ ব্রতপালনের উদ্দেশ্য হলো কোনো আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য বিশেষ কিছু আচার-বিধি পালন করা। হিন্দুধর্মাবলম্বীরা বিপত্তারিণী, জামাইষষ্ঠী, জন্মাষ্টমী, শিবরাত্রি ইত্যাদি অনেক ব্রত পালন করে থাকেন।

ব্রতপালনের কিছু সুনির্দিষ্ট নিয়মও আছে। ব্রতের আগের দিন সংযম পালন করতে হয় এবং ব্রতের দিন ব্রত শেষ হওয়া পর্যন্ত উপবাস অবশ্য করণীয়। যে দিনে বা তিথিতে যে ব্রত উদ্‌যাপন করা হয়, সে দিনে বা তিথিতে ভক্তগণ উপবাস থেকে নির্দিষ্ট দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে পূজা নিবেদন করেন। প্রতিটি ব্রতের ব্রতকথা আছে। ব্রত-পালনের সময় সুনির্দিষ্ট ব্রতকথা বলা বা পাঠ করা হয়। ভক্তগণ ভক্তিসহকারে সে ব্রতকথা শোনেন।

শিবরাত্রি ব্রত

ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশী তিথির রাত্রিতে শিবের আরাধনা করা হয়। শিব মঙ্গলময়। তিনি জগতের অকল্যাণ, অসুন্দর ও অন্যায় দূর করেন। তাই তাঁর অনুগ্রহ লাভের জন্য যে-ব্রত পালন করা হয়, তাকেই 'শিবরাত্রি ব্রত' বলা হয়।

শিব অল্পতেই তুষ্ট হন। এজন্য তাঁর এক নাম 'আশুতোষ'। একদিন শিব-পার্বতী একত্রে অবস্থান করছিলেন। পার্বতী শিবকে প্রশ্ন করেছেন, তিনি কীসে তুষ্ট হন? উত্তরে শিব বলেন, কেউ উপবাসী হয়ে ভক্তিভরে একটিমাত্র বিল্বপত্র দিয়েও আমার অর্চনা করলে আমি তাতেই তুষ্ট হই। বহু উপচারে আমার অর্চনা করার প্রয়োজন হয় না। হে দেবী, এই হলো আমার প্রীতিকর ব্রত। এই ব্রতের ফলস্বরূপ ভক্ত তার বাসনার বস্তু পেয়ে থাকে। আমার অনুগ্রহ তার প্রতি সর্বক্ষণ বর্ষিত হয়।

এ কথার অর্থশিব ভক্তের ভক্তি দেখেন, উপচারের বাহুল্য নয়। তাই শ্রদ্ধাসহ ভক্তের সামান্য বিল্বপত্রের অঞ্জলিতেই তিনি তুষ্ট হন।

শিবরাত্রি ব্রত পালনের কিছু নিয়ম রয়েছে। যেমন–শিবরাত্রির আগের দিন থেকেই ভক্ত সংযম অবলম্বন করবেন। বাক্যে, কর্মে ও চিন্তায় দেহ-মনকে পবিত্র রাখবেন। উপবাস থেকে সারাদিন প্রয়োজনীয় কাজের মধ্যেও শিবকে স্মরণ করবেন।

শিবরাত্রির আনুষ্ঠানিক কর্মের মধ্যে রয়েছে রাত্রির চার প্রহরে শিবকে চারবার অর্চনা করা। প্রথম প্রহরে শিবকে দুধ দিয়ে স্নান করাতে হয়। দ্বিতীয় প্রহরে দধি দিয়ে। তৃতীয় প্রহরে ঘৃত দিয়ে এবং চতুর্থ প্রহরে মধু দিয়ে। প্রতিবার স্নানের শেষে পূজা ও ধ্যান করতে হয়। এভাবে সারারাত শিবের পূজায় কাটে। পরের দিন ভক্ত শিবকে পূজা দিয়ে উপবাস ভেঙে পারণ করেন।

দলীয় কাজ: ব্রতপালনের উদ্দেশ্যসমূহ দলীয়ভাবে আলোচনা করে খাতায় লেখো।

নতুন শব্দ: ব্রত, বিল্বপত্র, অঞ্জলি।

পাঠ ৪ : শিবরাত্রির ব্রতকথা

শিবরাত্রির একটি ব্রতকথা আছে। এখন সেই ব্রতকথাটি শোনা যাক:

‘শিবরহস্য’ নামক ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে—পুরাকালে বারাণসী নগরে এক ব্যাধ বাস করতেন। তাঁর খর্বদেহ, কৃষ্ণকায়, পিঙ্গল চোখ ও পিঙ্গল চুল। দেখতে ভয়ংকর ছিলেন সেই ব্যাধ। আবার তাঁর সঙ্গে থাকত পশু-পাখি ধরার জাল, অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি। বনের পশু-পাখি শিকার করে তাদের মাংস বিক্রি করাই ছিল তাঁর পেশা।

একদিন তিনি বনে গিয়ে প্রচুর পশু শিকার করলেন। তারপর মাংসের ভার বহন করে বাড়ির দিকে রওনা করলেন। বোঝা খুব ভারী ছিল। চলেও গিয়েছিলেন গভীর বনে। ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে তিনি বিশ্রামের জন্য একটি গাছের গোড়ায় শুয়ে পড়লেন। দারুণ ক্লান্তিতে তিনি অতি দ্রুত ঘুমিয়ে পড়লেন। সূর্য অস্ত গেল। রাত নামল। চতুর্দশী তিথির অন্ধকার রাত। গভীর অন্ধকারে তিনি কী করে বাড়ি ফিরবেন! অন্ধকারে বন্যপশুরা যদি আক্রমণ করে! এসব ভেবে তিনি একটি গাছের ডালে শিকারকরা পশুর মাংস ঝুলিয়ে রাখলেন এবং নিজে চড়ে বসলেন ঐ গাছের ডালে। গাছটি ছিল বেলগাছ।

গভীর রাতে শীতার্ত ও ক্ষুধার্ত ব্যাধের শরীর কাঁপতে লাগল। তখন আবার শিশির পড়ছিল। ঠান্ডা শিশিরে ব্যাধের কাঁপুনি গেল বেড়ে।

ঘটনাচক্রে সেই বেলগাছের গোড়ায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন শিবের প্রতীক শিবলিঙ্গ। শিবচতুর্দশীর রাত্রিতে শিবের পূজা করতে হয়। শিবকে বেলপাতা দিয়ে, জল দিয়ে পূজা করতে হয়। ব্যাধ শীতে কাঁপছিলেন এবং সজোরে গাছের ডাল চেপে ধরেছিলেন। তাতে শিশিরভেজা বেলপাতা আপনা থেকেই ছিন্ন হয়ে শিবলিঙ্গের ওপর পড়ল। এভাবেই তো ভক্তেরা জল ও বেলপাতা দিয়ে শিবচতুর্দশীর রাত্রিতে শিবের পূজা করে থাকেন। ঐ ব্যাধও জল (শিশির) ও বেলপাতা দিয়ে নিজের অজ্ঞাতেই শিবের পূজা করে ফেলেন। তিথিমাহাত্ম্যে ব্যাধও শিব পূজার পুণ্যফল অর্জন করলেন। কিন্তু ব্যাধ নিজে তা জানতে পারলেন না।

ব্যাধ যখন মারা গেলেন তখন যমদূতেরা চলে এলেন তাঁর আত্মাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কারণ তিনি জীবনে যে পাপ করেছিলেন তার জন্য তাঁকে নরকবাস করতে হবে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ চলে এলেন শিবদূতেরা। তাঁরা তাঁকে শিবধামে নিয়ে যাবেন। তখন শিবদূত ও যমদূতদের মধ্যে ঝগড়া লেগে গেল। পাপের ফলে যার যমালয়ে যাওয়ার কথা, তাঁকে শিবদূতেরা শিবধামে নিয়ে যেতে চান! কিন্তু শিবদূতদের জন্য যমদূতেরা ব্যাধের কাছে ঘেঁষতে পারছেন না। তখন তাঁরা যমরাজের কাছে গিয়ে

২০২৫

ঘটনাটা জানালেন। যমরাজ তখন শিবধামে গিয়ে শিবের সেবক নন্দীর কাছে জানতে চাইলেন, একজন ঘোর পাপীকে কেন যমালয়ের পরিবর্তে শিবধামে নেওয়ার জন্য শিবদূতেরা গিয়েছেন? ঐ ব্যাধ কী এমন পুণ্য করেছেন, যার জন্য বহুপুণ্যের ফলে যে শিবধাম পাওয়া যায়, সেই শিবধামে যাওয়ার যোগ্য হলেন তিনি?

তখন নন্দী যমরাজকে ব্যাধের ঐ শিবপূজার কথা জানালেন। তিনি বললেন, 'পাপীও যদি শিবরাত্রিতে যথাবিধি শিবের পূজা করে, তাহলে তার সমস্ত পাপের বিনাশ ঘটে এবং সে পুণ্যবানের ন্যায় শিবধাম প্রাপ্ত হয়। এভাবেই ঐ ব্যাধের সকল পাপের বিনাশ ঘটেছে এবং সে পুণ্যবান হয়ে শিবধাম প্রাপ্তির যোগ্যতা অর্জন করেছে।'

শিবচতুর্দশীতে শিবরাত্রি ব্রতের মাহাত্ম্যের কথা শুনে যমরাজ বিস্মিত হলেন। এভাবেই শিবরাত্রি ব্রতের মাহাত্ম্যের কথা কৈলাসে, দেবলোকে ও পৃথিবীতে প্রচারিত হয়। তখন থেকে শিবভক্তেরা প্রতিবছর শিবরাত্রি ব্রত পালন করে আসছেন।

নতুন শব্দ: শিবচতুর্দশী, শ্রান্ত, ব্যাধ, পিঙ্গল।

পাঠ ৫ : ব্রতপালনের গুরুত্ব

হিন্দুধর্মের একটি বিশ্বাস এই যে, ব্রতপালন করলে উদ্দিষ্ট দেবতা ব্রতীর আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেন। 'ব্রতের মাধ্যমে আমার আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে'–এ বিশ্বাসের জাগরণ এবং সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য ব্রতীর ক্রিয়াশীল হওয়া ব্রতপালনের একটি বিশেষ প্রাপ্তি।

ব্রতে আলপনা কেটেও আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটানো হয়। যেমন; ধানের গোলা আঁকলে বাস্তবে প্রকৃত ধানের গোলা হবে ব্রতীর মনে এ বিশ্বাস জন্মে। সেঁজুতি ব্রতের একটি মন্ত্র হচ্ছে:

আমি দিই পিটুলির গোলা।
আমার হোক সত্যিকারের গোলা॥

২০২৬

লক্ষ্মীদেবীর পায়ের চিহ্ন আঁকলে সেই চিহ্নে পা ফেলে-ফেলে লক্ষ্মীদেবী নিজেই ঘরে আসবেন। ব্রতীকে ধনসম্পদ দান করবেন। ব্রতী সুখী হবেন।

অক্ষয় তৃতীয়ার ব্রতকথা আমাদের দানের প্রতি উৎসাহিত করে। অরণ্যষষ্ঠী ব্রত পালন করলে সন্তান-সন্ততি দীর্ঘায়ু ও ঐশ্বর্যশালী হয়। দুর্বাষ্টমী ব্রত পালন করলে সাতপুরুষ সুখে থাকা যায় এবং দুর্বার মতো সজীব ও আনন্দময় হয় বংশের সকলের জীবন।

এভাবে ব্রতপালনের মধ্য দিয়ে ব্রতীর আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়। ব্রতকে কেন্দ্র করে উপবাসের মধ্য দিয়ে দেহ ও মন সংযত হয়, পবিত্র হয়। শরীর ও মন দুই-ই ভালো থাকে।

তৃতীয় অধ্যায়: হিন্দুধর্মের স্বরূপ ও বিশ্বাস

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন:

১। হিন্দুধর্মের সাধারণ লক্ষণ কোনটি?

ক. বেদ

খ. স্মৃতি

গ. অহিংসা

ঘ. সদাচার

২। ব্রতপালনে অবশ্য করণীয় কী?

ক. গরিবদের দান করা

খ. না খেয়ে থাকা

গ. মন দিয়ে পড়া লেখা করা

ঘ. সংসার ধর্ম পালন করা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
সন্তোষ বাবু শিক্ষকতা করেন। তিনি নিজে অধ্যয়ন করেন এবং শিক্ষার্থীদেরও মনোযোগ সহকারে পড়ান। শিক্ষার্থীদের আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। কর্ম ও মেধার গুণে তিনি এই পেশায় থেকে আত্মতৃপ্তি নিয়ে সুখে জীবন কাটান। তিনি সংসার ধর্ম পালনকালে সকলের প্রতি নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেন।

৪। আশ্রমধর্ম অনুসারে সন্তোষ বাবু কার্যকলাপ কোন আশ্রমের অন্তর্গত?

ক. ব্রহ্মচর্য

খ. গার্হস্থ্য

গ. বানপ্রস্থ

ঘ. সন্ন্যাস

৫। বর্ণপ্রথা অনুসারে সন্তোষ বাবু যে স্তরে অবস্থান করছেন তা নির্ধারিত হয়:

i. নির্দিষ্ট পরিবারে জন্মের মাধ্যমে

ii. ব্যক্তির গুণ ও কর্মের দ্বারা

iii. বয়স ও অভিজ্ঞতার দ্বারা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　　খ. ii ও iii

গ. i ও iii　　ঘ. i , ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্নঃ
কালু চৌর্যবৃত্তির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। এ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য অনেকেই তাকে বোঝালেও সে এ কাজ ছাড়তে পারে না। কালু একদিন চুরি করতে গিয়ে নদীতে পড়ে হাবুডুবু খেতে থাকে। সজল নদীর পাড় দিয়ে যাওয়ার সময় কালুকে দেখতে পায়। কালু কাজকর্ম সম্পর্কে তার জানা থাকলেও সে কালুকে নদী থেকে টেনে তুলে। এর পর হতে কালুর আত্মগ্লানি হয় , তার মনের নির্দেশে সে চুরি করা ছেড়ে দেয়।

ক. স্মৃতিশাস্ত্র কাকে বলে?

খ. কোন ব্রত পালন করলে সব পাপের বিনাশ ঘটে? ব্যাখ্যা করো।

গ. সজলের আচরণের মাধ্যমে ধর্মের যে সাধারণ লক্ষণটি প্রতিফলিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকে কালুর মানসিকতা ধর্মের বিশেষ লক্ষণের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. ধর্মের বিশেষ লক্ষণ সম্পর্কে মনুসংহিতায় কী বলা হয়েছে?

২. সনাতন ধর্মে সদাচার গুরুত্বপূর্ণ কেন?

৩. কেনো শিবরাত্রি ব্রত পালন করা হয়?

চতুর্থ অধ্যায়

নিত্যকর্ম ও যোগাসন

নিত্যকর্ম ও যোগাসন

নিত্যকর্ম হলো পরম পবিত্র কর্ম। নিত্যকর্ম অনুশীলন করলে যোগ, তপ, সাধনা, কাজ-কর্ম, উপভোগ, আনন্দ, স্ফূর্তি সবকিছুই ভালো লাগে এবং জাগতিক ও পারমার্থিক মঙ্গল লাভ হয়। তাই সকলেরই নিত্যকর্মগুলো নিয়মিত করা উচিত। আর শরীরই হচ্ছে ধর্ম-কর্মের মূল আধার তাই শাস্ত্রে বলা হয়েছে: **'শরীরম্ আদ্যং খলু ধর্মসাধনম্'**। অর্থাৎ আগে শারীরিক সুস্থতা, পরে ধর্মচর্চা। তাই শরীরকে নীরোগ ও মনকে শান্ত রাখার জন্য সকলেরই যোগাসন অনুশীলন করা কর্তব্য। যোগাসন বহু প্রকারের। সে সবের মধ্যে আমরা এ অধ্যায়ে গোমুখাসন, ভুজঙ্গাসন ও বজ্রাসন সম্পর্কে জানব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- নিত্যকর্ম অনুশীলনের প্রভাব বর্ণনা করতে পারব;
- গোমুখাসনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- গোমুখাসন অনুশীলন-পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব;
- গোমুখাসন অনুশীলন এবং এর প্রভাব বর্ণনা করতে পারব;
- ভুজঙ্গাসনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ভুজঙ্গাসন অনুশীলন-পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব;

- ভুজঙ্গাসন অনুশীলন এবং এর প্রভাব বর্ণনা করতে পারব;
- বজ্রাসনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বজ্রাসন অনুশীলন-পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব;
- বজ্রাসন অনুশীলন এবং এর প্রভাব বর্ণনা করতে পারব ।

পাঠ ১ : নিত্যকর্ম অনুশীলনের প্রভাব

যাঁরা নিত্যকর্মের অনুশীলন করেন তাঁদের মন ধীর, স্থির ও শান্ত থাকে; শরীর সুস্থ ও কর্মঠ থাকে এবং তাঁদের জীবন শুদ্ধ, পবিত্র ও নির্মল হয় । নিত্যকর্মের ফলে কাজ করার একটি সুন্দর অভ্যাস গড়ে ওঠে । সব কাজ তাঁরা সঠিক সময়ে সঠিকভাবে করতে পারেন । কোনো কাজে তাঁদের অলসতা আসে না । কাজের প্রতি একটা উৎসাহ সৃষ্টি হয় । ফলে কাজটাও যেমন সুন্দর হয়, তেমনি সকল কাজে সফলতাও আসে । কথায় বলে, **'সময়ের এক ফোঁড়, অসময়ের দশ ফোঁড়'** । অর্থাৎ সময়মতো কোনো কাজ না করলে, অসময়ে সেই কাজ করতে গেলে অনেক ঝামেলা হয় ।

নিত্যকর্মের দ্বারা শুভকর্মের ফল সর্বদাই প্রত্যক্ষ করা যায় । প্রত্যেক শুভকর্ম করার জন্য একটা সময় নির্ধারন করতে যায় । নিত্যকর্ম সম্পাদনকারীদের ঘরবাড়ি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, শুদ্ধ ও পবিত্র থাকে । ভোরে ঘুম ভাঙতেই ব্রাহ্মমুহূর্তে শুভ সংকল্প করে মন্ত্র পাঠের মাধ্যমে শ্রদ্ধা-ভক্তি সহকারে ঈশ্বরকে ডাকলে আলস্য দূর হয় এবং সমস্ত দিন সুন্দরভাবে কেটে যায় । প্রাতঃকালের আধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ডের ফল দিনের যেকোনো সময়ে অনুষ্ঠিত পারমার্থিক কর্মের ফল থেকে অনেক বেশি । প্রতিদিন গুরুজনকে প্রণাম করলে নমস্কার জানালে তাঁদের প্রতি কখনো খারাপ ব্যবহার, অসম্মান বা

২০২১

অমর্যাদা করার সাহস হয় না। নমস্কার বিনম্রতার প্রতীক। যেখানে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সম্মানের ভাব থাকে সেখানে বিনম্রতার সৃষ্টি হয়। সেজন্য পিতা-মাতা, বিদ্বান, বয়োবৃদ্ধ ও গুরুজনদের নিত্য নমস্কার করা উচিত।

প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা যোগব্যায়াম করলে শরীর সুস্থ থাকে। সুতরাং নিয়মিত যোগাসন করলে শরীর হৃষ্টপুষ্ট, বলবান, শক্তিশালী, ওজস্বী ও তেজস্বী হয় এবং সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে করা যায়। মানুষমাত্রই শান্তির জন্য ঈশ্বরের উপাসনা করে। প্রতিদিন পূজাঅর্চনা ও উপাসনাদি দ্বারা ভগবানের নাম উচ্চারণ এবং তাঁর উদ্দেশ্যেপ্রার্থনা জানানোর ফলে আধ্যাত্মিক চেতনা জাগ্রত হয়। এর ফলে ঈশ্বরকে লাভ করা যায়। কর্মে অনাসক্ত ব্যক্তির কোনো কর্মেই মন বসে না। তারা যাকিছু করে তা বাধ্যতামূলক, সানন্দে করে না। তাই তারা জীবনে উন্নতি লাভ করতে পারে না। সুতরাং আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত নিত্যকর্মের অনুশীলন করা।

নতুন শব্দঃ ব্রাহ্মমুহূর্ত, আধ্যাত্মিক, পারমার্থিক, ওজস্বী, তেজস্বী, নিষ্কর্মা, বাধ্যতামূলক।

পাঠ ২ : গোমুখাসনের ধারণা, অনুশীলন-পদ্ধতি ও প্রভাব

গোমুখাসনের ধারণা

এই আসনে অবস্থানকালে আসন অভ্যাসকারীর পায়ের অবস্থান গরুর মুখের মতো হয়। তাই এ আসনের নাম গোমুখাসন।

অনুশীলন-পদ্ধতি

প্রথমে দুই পা সামনের দিকে লম্বা করে ছড়িয়ে সোজা হয়ে বসতে হবে। তারপর ডান পা হাঁটুতে ভেঙে বাঁ পায়ের হাঁটুর ওপর দিয়ে নিয়ে গিয়ে ডান পায়ের গোড়ালি বাঁ নিতম্ব স্পর্শ করাতে হবে। বাঁ পা হাঁটুতে ভেঙে বাঁ পায়ের গোড়ালি ডান নিতম্বের পাশে স্পর্শ করাতে হবে। এবার ডান হাত মাথার ওপর তুলে কনুইতে ভেঙে ঘাড় বরাবর পিঠের ওপর দিয়ে নিচে নামাতে হবে। বাঁ হাত কনুইতে ভেঙ্গে পেছনে পিঠের ওপর দিয়ে ওপরের দিকে নিতে হবে। এবার দুই হাতের আঙুলগুলো বড়শির মতো করে এক হাত দিয়ে অপর হাত ধরতে হবে। এসময় ঘাড় ও মেরুদণ্ড সোজা থাকবে। দৃষ্টি থাকবে সামনের দিকে। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে এভাবে ৩০ সেকেন্ড থাকতে হবে। তারপর হাত দুটো ছেড়ে, পা-দুটো আগের মতো লম্বা করে সামনের দিকে ছড়িয়ে দিতে হবে। এরপর ডানের জায়গায় বাঁ আর বাঁয়ের জায়গায় ডান করে অর্থাৎ হাত-পা বদল করে আসনটা আবার করতে হবে। এরপর ৩০ সেকেন্ড শবাসনে বিশ্রাম নিতে হবে। এ রকম চারবার করতে হবে। মনে রাখতে হবে, ডান হাঁটু যখন বাঁ হাঁটুর ওপর থাকবে তখন ডান হাত ওপরে উঠবে। আর বাঁ হাঁটু যখন ডান হাঁটুর ওপর থাকবে তখন বাঁ হাত ওপরে উঠবে।

একক কাজ: গোমুখাসনটি অনুশীলন করে দেখাও।

প্রভাব

গোমুখাসন নিয়মিত অনুশীলন করলে—

১. পায়ের পেশি নমনীয় হয়, পায়ের ব্যথা দূর হয়;
২. হাঁটুর বাত নিরাময় হয়;
৩. পিঠের মাংসপেশির ব্যথা দূর হয়;
৪. অসমান কাঁধ সমান হয়;
৫. কাঁধের সন্ধিস্থলের ব্যথা দূর হয়;
৬. মেরুদণ্ড নমনীয় হয়, বাঁকা মেরুদণ্ড সোজা হয়;
৭. পরিপাক যন্ত্রের গোলযোগ ও কোষ্ঠাবদ্ধতা দূর হয়;
৮. হজমশক্তি বৃদ্ধি পায়;
৯. অনিদ্রা দূর হয়;
১০. মনের অস্থিরতা ও চঞ্চলতা দূর হয়, মন শান্ত থাকে।

দলীয় কাজ: গোমুখাসন অনুশীলনের উপকারিতা লিখে একটি পোস্টার তৈরি করো।

নতুন শব্দ: গোমুখাসন, গোড়ালি, নিতম্ব, বাত, পেশি, পরিপাক যন্ত্র, নিরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, নমনীয়, সন্ধিস্থল।

২০২৩

পাঠ ৩ : ভুজঙ্গাসনের ধারণা, অনুশীলন-পদ্ধতি ও প্রভাব

ভুজঙ্গাসনের ধারণা

'ভুজঙ্গ' শব্দের অর্থ সাপ। এই আসনে অবস্থানকালে কোমর থেকে দেহের ওপরের অংশকে ওপরে তুলতে হয়। এ সময় এই আসন অভ্যাসকারীকে ফণাতোলা ভুজঙ্গ বা সাপের মতো দেখায়। তাই এ আসনের নাম ভুজঙ্গাসন। একে সর্পাসনও বলা হয়।

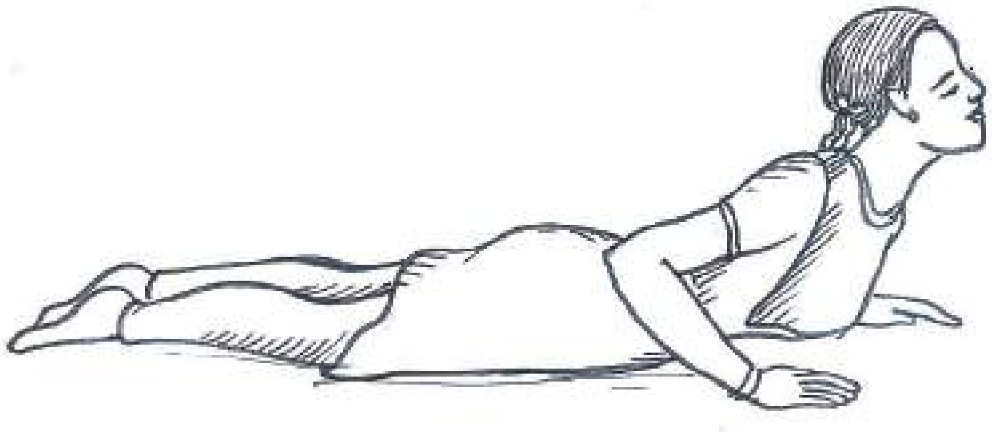

অনুশীলন-পদ্ধতি

শরীরের সমস্ত মাংসপেশিকে শিথিল করে পা-দুটো জোড়া ও লম্বা করে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়তে হবে। পায়ের আঙুলগুলো মাটির সাথে লেগে থাকবে। হাঁটু, উরু ও গোড়ালি সোজা থাকবে। দুই হাত কনুইয়ের কাছ থেকে ভেঙে দুই হাতের তালু উপুড় করে পাঁজরের কাছে দুই পাশে মাটিতে রাখতে হবে। এরপর হাতের ওপর অল্প ভর দিয়ে চিবুক ওপরে তুলে ঘাড় পেছন দিকে নিতে হবে এবং সঙ্গেসঙ্গে পা থেকে নাভি পর্যন্ত শরীরের নিচের অংশ ভূমি-সংলগ্ন রেখে দেহের ওপরের অংশ হাতের ওপর বেশি জোর না দিয়ে শুধু বুক ও কোমরের ওপর জোর দিয়ে ওপরে তুলতে হবে। এ অবস্থায় সমস্ত শরীর শিথিল করে ৩০ সেকেন্ড থাকতে হবে। এরপর আস্তেআস্তে পেট, বুক, ঘাড় ও চিবুক নামিয়ে ভূমিসংলগ্ন করতে হবে এবং ৩০ সেকেন্ড চিৎ হয়ে শবাসনে বিশ্রাম নিতে হবে। এভাবে এই আসন ও শবাসন চারবার অভ্যাস করতে হবে। এই আসন অভ্যাসকালে শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে।

২০২৬

একক কাজ: ভুজঙ্গাসনটি অনুশীলন করে দেখাও।

প্রভাব

ভুজঙ্গাসন নিয়মিত অনুশীলন করলে—

১. মেরুদণ্ড নমনীয় হয়;

২. বাঁকা মেরুদণ্ড সোজা ও সরল হয়;

৩. মেরুদণ্ডের বাত সারে;

৪. পিঠের ও কোমরের পেশি মজবুত হয়, কোমরে ব্যথা হতে পারে না;

৫. স্নায়ুমণ্ডলী সতেজ হয়;

৬. শরীরের নিস্তেজ ভাব দূর হয় ও নতুন শক্তি জন্মায়;

৭. হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস সবল হয়;

৮. বুকের গঠন সুন্দর হয় এবং দেহের লাবণ্য বৃদ্ধি পায়;

৯. যকৃৎ ও প্লীহার কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং হজমশক্তি বাড়ে;

১০. অজীর্ণ, অম্বল, অক্ষুধা, গ্যাস্ট্রিক, উচ্চ রক্তচাপ ইত্যাদি রোগে সুফল পাওয়া যায়;

১১. যারা কোলকুঁজো তাদের বিশেষ উপকার হয়।

দলীয় কাজঃ ভুজঙ্গাসন অনুশীলনে কী কী উপকার হয়, তার একটি তালিকা তৈরি করো।

নতুন শব্দঃ ভুজঙ্গ, চিবুক, পাঁজর, সংলগ্ন, নিস্তেজ, লাবণ্য, কোলকুঁজো, যকৃৎ, প্লীহা, অজীর্ণ, অম্বল।

পাঠ ৪ : বজ্রাসনের ধারণা, অনুশীলন-পদ্ধতি ও প্রভাব

বজ্রাসনের ধারণা

যোগশাস্ত্রমতে আসনটি অভ্যাসে দেহের নিম্নভাগের স্নায়ু ও পেশি বজ্রের মতো কঠিন, মজবুত ও দৃঢ় হয়। তাই আসনটির নাম বজ্রাসন। এটি খাওয়ার পরে করা একমাত্র আসন।

অনুশীলন-পদ্ধতি

হাঁটু ভেঙে পা-দুটো পেছন থেকে মুড়ে নিতম্বের নিচে এমনভাবে রাখতে হবে, যাতে গোড়ালি দুটো বাইরের দিকে বেরিয়ে থাকে এবং পায়ের গোড়ালি নিতম্বের সঙ্গে লেগে থাকে। এ অবস্থায় দুই পায়ের বুড়ো আঙুল পরস্পরের সঙ্গে

২০২৬

লেগে থাকবে এবং কোমর, গ্রীবা ও মাথা সোজা থাকবে। দুই হাঁটু পরস্পরের সঙ্গে লেগে থাকবে। হাতের কনুই না ভেঙে ডান হাত থাকবে ডান হাঁটুর ওপর, আর বাঁ হাত থাকবে বাঁ হাঁটুর ওপর। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে এভাবে ৩০ সেকেন্ড বসতে হবে। তারপর ৩০ সেকেন্ড শবাসনে বিশ্রাম নিতে হবে। এভাবে ৩-৪বার অভ্যাস করতে হবে।

একক কাজঃ বজ্রাসনটি অনুশীলন করে দেখাও।

প্রভাব

বজ্রাসন নিয়মিত অনুশীলন করলে–

১. হাঁটু ও গোড়ালির গাঁটের বাতজনিত ব্যথা দূর হয়;

২. পায়ের পেশি ও স্নায়ুজাল সতেজ ও সক্রিয় হয়;

৩. ক্ষুধামান্দ্য ও অনিদ্রা দূর হয়;

৪. মনের চঞ্চলতা দূর হয়;

৫. স্বাস্থ্য সুন্দর ও লাবণ্যময় হয়;

৬. পরিপূর্ণ আহারের পর এ আসনটি ৫ থেকে ১৫ মিনিট অভ্যাস করলে খাদ্যবস্তু সহজে হজম হয় এবং হজমশক্তি বৃদ্ধি পায়

৭. বজ্রাসনে বসে চুল আঁচড়ালে সহজে চুল পাকে না বা পড়ে না।

দলীয় কাজঃ বজ্রাসনের উপকারিতা লিখে একটি পোস্টার তৈরি করো।

নতুন শব্দঃ বজ্রাসন, দৃঢ়, গ্রীবা, গাঁট, স্নায়ুজাল।

নমুনা প্রশ্ন:

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. ব্রাহ্মমুহূর্তে কোন কার্যকলাপ করা হয়?

ক.গুরুজনদের প্রণাম করা

খ. শুভ সংকল্প করে মন্ত্র পাঠ করা

গ. ঘরবাড়ি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা

ঘ. নিয়মিত যোগাসন করা

৩.পায়ের অবস্থান একটি চারপেয়ে প্রাণীর মুখের মতো করে নিয়মিত অনুশীলন করলে -

i. হাঁটুর বাত নিরাময় হয়

ii. মেরুদন্ড সোজা হয়

iii. কোলকুঁজো রোগের উপকার হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক.i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ.i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী শ্রেয়সী লেখাপড়ার পাশাপাশি নিয়মিত যোগাসন অনুশীলন করে। সে হাঁটু, ঊরু ও গোড়ালি সোজা রেখে একটি আসন অনুশীলন করে এবং এতে সে সুফলও পায়। শ্রেয়সীর বোন উষসী কখনই ঘরবাড়ি অপরিষ্কার রাখে না, নিজে সব সময় পরিষ্কার জামাকাপড় পরে খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে তার দিনটা শুরু করে।এতে তার মন সবসময় ভালো থাকে।

৪.শ্রেয়সী কোন যোগাসনটি অনুশীলন করে?

ক.বজ্রাসন

খ. শবাসন

গ. ভুজঙ্গাসন

ঘ. গোমুখাসন

৫. উষসীর মতো কার্যক্রম নিয়মিত করার ফলে-

ক. কাজের আগ্রহ বেড়ে যায়

খ. পায়ের পেশি সবল হয়

গ. ঘুমের সমস্যা থাকে না

ঘ.জীবনে কাঙ্ক্ষিত উন্নতি হয়

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১. মিতা পড়ালেখায় ভালো কিন্তু নিয়মিত স্কুলে যায় না। শ্রেণি শিক্ষক কারণ জানতে চাইলে মিতা জানায়, তার মা প্রায়ই অসুস্থ থাকেন। তার মায়ের সমস্যা হলো কোনো খাবার খাওয়ার পর তিনি উদ্বেগ ও অস্বস্তি বোধ করেন এবং হজম করতে পারেন না। ওষুধ খেয়ে ও সুফল পাচ্ছেন না। সব শোনার পর শিক্ষক মিতার মাকে একটি যোগাসনের অনুশীলন করতে বলেন। শিক্ষকের কথামতো মিতার মা উক্ত আসন অনুশীলন করে সুস্থতার পথে। কিন্তু তার বোন সুকন্যা ছোটবেলা থেকেই চঞ্চল ও অস্থির প্রকৃতির। বড় হওয়ার পর সবাই খেয়াল করে তার মেরুদন্ড ও কাঁধ বাঁকা। এ নিয়ে বাড়ির সবাই চিন্তিত।

ক. বজ্রাসন কাকে বলে?

খ. সঠিক সময়ে সঠিক কাজ করার অভ্যাসকে কী বলে? ব্যাখ্যা কর

গ. উদ্দীপকে শিক্ষক মিতার মায়ের সুস্থতার জন্য যে আসন অনুশীলন করতে বলেন তা ব্যাখ্যা করো।

ঘ. সুকন্যা যে আসন অনুশীলন দ্বারা তার সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে সুস্থ জীবনের জন্য তার প্রভাব মূল্যায়ন করো।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. গোমুখাসন অনুশীলনের মাধ্যমে শরীরে কী কী পরিবর্তন ঘটে?

২. মনের চঞ্চলতা দূর করার জন্য কোন আসন করা যেতে পারে? ব্যাখ্যা করো।

৩. যোগাসন অনুশীলনের মাধ্যমে কী উপকার হয় তা লেখো।

পঞ্চম অধ্যায়

দেব-দেবী ও পূজা-পার্বণ

ঈশ্বর নিরাকার হলেও মানবকল্যাণে তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়ে থাকেন। ঈশ্বর যখন নিজের কোনো গুণ বা ক্ষমতাকে কোনো বিশেষ আকার বা রূপে প্রকাশ করেন, তখন তাঁকে দেবতা বা দেব-দেবী বলে। যেমন; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি। ব্রহ্মা সৃষ্টির দেবতা, ভগবান বিষ্ণু প্রতিপালন ও রক্ষাকারী দেবতা এবং শিব ধ্বংসের দেবতা।

হিন্দু ধর্মগ্রন্থ অনুসারে আমরা তিন প্রকার দেব-দেবীর পরিচয় পাই তাঁরা হলেন বৈদিক দেবতা, পৌরাণিক দেবতা ও লৌকিক দেবতা।

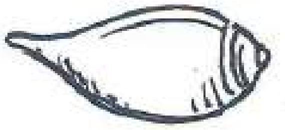

বৈদিক দেবতা: যেসকল দেবতার নাম বেদে উল্লিখিত হয়েছে, তাঁদের বৈদিক দেবতা বলা হয়। যেমন: অগ্নি, ইন্দ্র, বিষ্ণু, ঊষা প্রভৃতি।

পৌরাণিক দেবতা: যেসকল দেবতার নাম পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে, তাঁদের পৌরাণিক দেবতা বলা হয়। যেমন: দুর্গা, কালী, গণেশ প্রভৃতি।

লৌকিক দেবতা: বেদে বা পুরাণে উল্লেখ নেই, কিন্তু লৌকিকভাবে পূজিত হন এমন দেবতাদের বলা হয়, লৌকিক দেবতা। যেমন: শীতলা, মনসা, শনি প্রভৃতি।

আমরা এসব দেব-দেবীর পূজা করে থাকি। দেব-দেবীর পূজা করলে ঈশ্বর খুশি হন এবং ভক্তের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেন।

'পূজা' ও 'পার্বণ' শব্দ দুটি আমরা সাধারণত সমার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু 'পূজা' মানে 'শ্রদ্ধা জ্ঞাপন'। দেব-দেবীকে পুষ্পপত্র, নৈবেদ্য ইত্যাদি দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করাকে পূজা বলে। আর 'পার্বণ' শব্দের অর্থ হলো 'পর্ব বা উৎসব'। 'উৎসব' মানে 'আনন্দানুষ্ঠান'। হিন্দুধর্মের বিধি-বিধান অনুসারে বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজায় বিভিন্ন ধরনের উৎসবের আয়োজন করা হয়। একেই বলে পার্বণ। পূজা উপলক্ষ্যে নানারকমের আয়োজন করা হয়। পূজার জন্য নানারকম উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবহার করা হয়। যেমন; প্রতিমা নির্মাণ, দেবতার ঘর সাজানো, বিভিন্ন ধরনের বাদ্য বিশেষ করে ঢাক, ঢোল, ঘণ্টা, কাঁসি, শঙ্খ ইত্যাদির আয়োজন, ভক্তদের সাথে ভাব বিনিময়, বিচিত্রধর্মী খাওয়া-দাওয়া, বিভিন্ন ধরনের আনন্দমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন, পরিচ্ছন্ন পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান ইত্যাদি।

পার্বণ পূজা অনুষ্ঠানকে অধিক আনন্দঘন করে তোলে। ফলে ঈশ্বর ও দেব-দেবীর প্রতি ভক্তি, একাগ্রতা, গভীর শ্রদ্ধাবোধ, নিজেদের মধ্যে সম্প্রীতি ও সংহতি ইত্যাদির সৃষ্টি হয়।

এ অধ্যায়ে আমরা পূজার উপকরণ বা উপচার, এগুলো ব্যবহারের তাৎপর্য, মনসা, নারায়ণ ও শনিদেবের পরিচয়, পূজাপদ্ধতি, প্রণামমন্ত্র ইত্যাদি সম্পর্কে জানব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা—

- পূজার উপকরণের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- পূজা-পার্বণ ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত প্রাকৃতিক উপচার ব্যবহারের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারব
- মনসাদেবীর পরিচয় ও পূজাপদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব
- মনসাপূজার প্রণামমন্ত্র বলতে, লিখতে এবং তার সরলার্থ ব্যাখ্যা করতে পারব
- মনসাদেবীর পূজার শিক্ষা ও প্রভাব বর্ণনা করতে পারব
- নারায়ণ ও শনিদেবের পরিচয় ও পূজাপদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব
- নারায়ণ ও শনিদেবের প্রণামমন্ত্র বলতে, লিখতে এবং তার সরলার্থ ব্যাখ্যা করতে পারব
- পারিবারিক জীবনে নারায়ণ ও শনি পূজার শিক্ষা ও প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব
- মনসা, নারায়ণ ও শনি পূজার শিক্ষা উপলব্ধি করে শ্রদ্ধাভরে পূজা-অর্চনায় উদ্বুদ্ধ হব
- প্রাকৃতিক উপচার সংরক্ষণে যত্নশীল হব
- পূজা-পার্বণের জন্য প্রাকৃতিক উপচার সংগ্রহ এবং পূজা-পার্বণের ধর্মীয় ও নান্দনিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করব।

পাঠ ১ ও ২ : পূজা-উপকরণের ধারণা এবং পূজা-উপকরণ ব্যবহারের তাৎপর্য

হিন্দুধর্মে বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করা হয়। পূজা করার বিভিন্ন রীতি-নীতি আছে, যাকে পূজাবিধি বলে। বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা সঠিকভাবে করার জন্য ও পূজার রীতি-নীতিসমূহ সঠিকভাবে পালন করার জন্য বিভিন্ন ধরনের সামগ্রীর প্রয়োজন হয়। এই ধরনের পূজাসামগ্রীকে পূজার উপকরণ বা উপচার বলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পূজার রীতি-নীতি বা বিধি অনুসারে অভীষ্ট দেবতার উদ্দেশে নৈবেদ্য সমর্পণ করতে হয়। নৈবেদ্যের জন্য বিভিন্ন ধরনের ফল, মিষ্টি বা অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন হয়। এগুলোকেও পূজার উপকরণ বা উপচার বলে।

দেব-দেবীর পছন্দ অনুসারে পূজা-উপকরণেরও ভিন্নতা রয়েছে। তবে সাধারণভাবে বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করার জন্য নিম্নবর্ণিত উপকরণসমূহ ব্যবহার করা হয়ে থাকে:

১. **বিগ্রহ বা প্রতিমা:** পূজায় দেব-দেবীর বিগ্রহ বা প্রতিমা নির্মাণ করা হয়।

২. **কলস বা ঘট:** পূজার উপকরণ হিসেবে মাটি বা ধাতুর তৈরি একটি কলস বা ঘট ব্যবহার করা হয়। পূজার সময় কলসটি গঙ্গা নদীর জল বা প্রবহমান নদীর পরিষ্কার জল দিয়ে পূর্ণ করা হয়। কলসকে মঙ্গলঘটও বলা হয়। অর্থাৎ কলস বা ঘট মঙ্গলের প্রতীক। একে মা পৃথিবীর সঙ্গে তুলনা করা হয়। কলসের মুখে আম্রপল্লব ও তার ওপর একটি সবুজ নারিকেল স্থাপন করা হয়। এদের সঙ্গে সজীবতার সম্পর্ক রয়েছে। কলসের সবচেয়ে চওড়া অংশ পৃথিবীকে নির্দেশ করে। এর কেন্দ্র জলকে নির্দেশ করে। কলসের ঘাড় অগ্নিকে নির্দেশ করে এবং মুখের খোলা অংশ বায়ুকে নির্দেশ করে।

৩. **প্রদীপ:** পূজার একটি উপকরণ প্রদীপ। প্রদীপসৃষ্ট আলো সকল অন্ধকার দূর করে বলে একে জ্ঞানের প্রতীক হিসেবে ধরা হয়। প্রদীপ আমাদের জীবনের আলো ও আত্মাকে নির্দেশ করে।

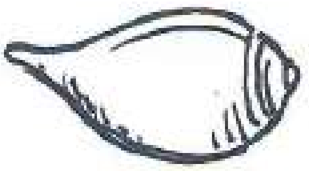

৪. **শঙ্খ:** শঙ্খ মঙ্গলসূচক পূজা-উপকরণ, যা সৃষ্টির পবিত্র ধ্বনি সৃষ্টি করে। এর সুরেলা ধ্বনি যেন সকলকে জ্ঞানের জগতে, ভক্তির জগতে আহ্বান জানায়, তোমরা এসো, দেবতার কাছে আনত হও, আত্মনিবেদন করো।

৫. **ফুলের মালা:** ফুলের মালা দেব-দেবীদের সম্মানিত ও সজ্জিত করার মাঙ্গলিক উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

২০২৬

৬. **আসন:** আসন দেবতাদের বসার জন্য ব্যবহার করা হয়।

৭. **মুকুট:** মুকুট দেবতাদের উচ্চ সম্মানের প্রতীক।

৮. **পান-সুপারি:** পানের মধ্যে বিভিন্ন দেবীর অধিষ্ঠান কল্পনা করা হয়। সুপারির কঠিন অংশ আমাদের অহংবোধের প্রতীক, যা পূজার শেষে দেবতার উদ্দেশ্যে সমর্পণ করা হয়।

৯. **কর্পূর:** সুগন্ধি কর্পূর পূজার পরিবেশকে বিশুদ্ধ ও স্নিগ্ধ করে।

১০. **গঙ্গাজল:** দেব-দেবীকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার জন্য পবিত্র গঙ্গার নদীর জল ব্যবহার করা হয়, কেননা হিন্দু ধর্মগ্রন্থ অনুসারে গঙ্গার জল পবিত্র। এ-জলে বিভিন্ন ধরনের রোগ-পীড়া ভালো করার ক্ষমতা বিদ্যমান। এ ছাড়াও এ-জল আধ্যাত্মিক চিন্তা-চেতনা ও বৈষয়িক সম্পদ বৃদ্ধির সহায়ক।

১১. **ধূপকাঠি:** ধূপকাঠি আমাদের ইচ্ছাসমূহ নির্দেশ করে, যা দেব-দেবীর পূজার সময় বিশেষ পাত্রে রেখে প্রজ্বলন করা হয়।

১২. **থালা:** থালায় বিভিন্ন সামগ্রী পূজার উদ্দেশ্যে রাখা হয়।

১৩. **ধূপ:** ধূপ এক ধরনের সুগন্ধযুক্ত ধোঁয়া সৃষ্টিকারী পূজা-উপকরণ, যা আমাদের খারাপ শক্তির প্রভাব থেকে মুক্ত করে বলে বিবেচনা করা হয়।

১৪. **চন্দন:** চন্দন কাঠ সুগন্ধি। চন্দন কাঠ জলে ঘষে অনুলেপন তৈরি করা হয়। চন্দনের গন্ধ পবিত্র পরিবেশের সৃষ্টি করে। এ কারণেই দেব-দেবীর উদ্দেশে সচন্দন পুষ্প বা বিল্বপত্র নিবেদন করা হয়। চন্দন একটি মঙ্গলজনক ও নান্দনিক পূজা-উপকরণ।

১৫. **আবির:** এক ধরনের লাল রঙের গুঁড়া, যা দেব-দেবীদের জন্য ব্যবহার করা হয়।

১৬. **চাল:** চাল বস্তুগত পূজা-উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

১৭. **নৈবেদ্য:** ফুল, ফল, মিষ্টিজাতীয় খাদ্য ইত্যাদি নৈবেদ্য হিসেবে প্রদান করা হয়, যা দেব-দেবীর কাছে আমাদের আত্মসমর্পণকে নির্দেশ করে।

১৮. **পঞ্চারতি:** একই সাথে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্বলন করা যায় এমন একটি পূজা-উপকরণ।

১৯. **ঘণ্টা:** পূজায় ঘণ্টা বাজানো হয়। এটি মঙ্গলজনক শব্দ সৃষ্টিকারী পূজা-উপকরণ।

২০. **হলুদ:** হলুদ পরিশুদ্ধ চিন্তাকে নির্দেশ করে এবং মনকে আর্কষণ করে। এ ছাড়াও হলুদ দেবী দুর্গার প্রতীক। হলুদে ভেষজ গুণ রয়েছে।

২১. **পবিত্র সুতা:** যজ্ঞের জন্য প্রয়োজন হয়।

একক কাজ: পূজার উপচারসমূহের নাম লেখো।

নতুন শব্দ: সমার্থক, বিচিত্রধর্মী, সম্প্রীতি, পঞ্চারতি।

পাঠ ৩ ও ৪ : মনসাদেবীর পরিচয় ও পূজাপদ্ধতি

মনসাদেবীর পরিচয়

মনসা সর্পের দেবী। তিনি সর্পকুলের জননী। তিনি আমাদের সর্পভয় থেকে রক্ষা করেন। তিনি উর্বরতা ও সমৃদ্ধির দেবী হিসেবেও পরিচিত। বাংলাদেশসহ পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে মনসাদেবীর পূজা করা হয়। মনসা মূলত লৌকিক দেবী। পরে পৌরাণিক দেবীরূপে পরিগণিত হয়েছেন। দেবী মনসা বিষহরি নামেও পরিচিত। কেননা তিনি সাপের বিষ হরণ করে থাকেন। ব্রহ্মার উপদেশে ঋষি বশিষ্ঠ সর্পমন্ত্রের সৃষ্টি করেন এবং তাঁর তপস্যার দ্বারা মন থেকে সেই মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে মনসার আবির্ভাব ঘটে। মন থেকে সাকার রূপ লাভ করেছেন বলে তাঁর নাম হয়েছে মনসা। পুরাণমতে তিনি জরৎকারু মুনির পত্নী, আস্তিক মুনির মাতা এবং সাপের রাজা বাসুকির বোন। তাঁর পিতার নাম কশ্যপ মুনি এবং মাতার নাম কদ্রু। তিনি নাগমাতা নামেও পরিচিত।

মনসাদেবীর চারটি হাত এবং তিনি গৌরবর্ণা। তাঁর আরেক নাম জগদ্গৌরী। চন্দ্রের মতো সুন্দর এবং প্রসন্ন তাঁর মুখমণ্ডল। অরুণ বর্ণের অর্থাৎ ভোরের সূর্যের আলোর মতো লাল রঙের কাপড় তিনি পরিধান করেন। তিনি সোনার অলংকার পরিধান করেন। কয়েকটা সাপ তাঁকে জড়িয়ে থাকে, যেন তাঁর অলংকার। হাঁস তাঁর বাহন। প্রসন্ন মুখে তিনি হাঁসের ওপর বসে থাকেন। এ ছাড়াও আটটি সাপ তাঁর হাত, মুকুট ও পাদদেশ ঘিরে থাকে।

মনসার পূজাপদ্ধতি

আষাঢ় মাসের কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিকে বলা হয় নাগপঞ্চমী। এসময় বাড়ির উঠানে সিজগাছ স্থাপন করে মনসাদেবীর পূজা করা হয়। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতেও মনসাপূজার বিধান আছে। বর্তমানে সর্বজনীনভাবে মনসাদেবীর মন্দিরে মনসাপূজা করা হয়। আবার পারিবারিক পর্যায়ে পারিবারিক মন্দিরেও মনসাদেবীর পূজা হয়।

মনসাপূজার মুখ্য উদ্দেশ্য সাপের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া। এজন্য অন্যান্য পূজার মতো সাধারণ
২০২৫ পূজাবিধি অনুসরণ করতে হয়। পূজার প্রারম্ভে সংকল্প গ্রহণ, মনসার প্রতিমা স্থাপন, আচমন, চক্ষুদান

প্রভৃতি বিধি অনুসরণ করতে হয়। এ ছাড়া মনসার ধ্যান, আবাহন মন্ত্রপাঠ এবং পূজার মন্ত্রপাঠ করতে হয়। অতঃপর স্নানমন্ত্র পাঠ করে মনসাদেবীকে স্নান করাতে হয় এবং অষ্ট নাগমন্ত্র পাঠের মাধ্যমে দেবীর পূজা আরম্ভ করতে হয়। শেষে পুষ্পাঞ্জলি ও প্রণামমন্ত্রের মাধ্যমে পূজা সমাপন করতে হয়। সবশেষে দেবী-প্রতিমাকে বিসর্জন দেওয়া হয়।

পাঠ ৫ : মনসাদেবীর প্রণামমন্ত্র এবং মনসাপূজার শিক্ষা ও প্রভাব

মনসাদেবীর প্রণামমন্ত্র

আস্তিকস্য মুনের্মাতা ভগিনী বাসুকে স্তথা।
জরৎকারুমুনেঃ পত্নী মনসাদেবি নমোহস্তুতে ॥

সরলার্থঃ আস্তিক মুনির মাতা, নাগরাজ বাসুকির ভগ্নি, জরৎকারু মুনির পত্নী, হে মনসাদেবী! তোমাকে প্রণাম।

মনসাপূজার শিক্ষা ও প্রভাব

মনসাদেবীর পূজা করলে সাপের ভয় থাকে না। মনসাদেবীর মাহাত্ম্য নিয়ে অনেক উপাখ্যান রচিত হয়েছে। সেসব উপাখ্যানে মনসাদেবীকে পূজা না করার ভয়াবহ পরিণাম এবং পূজা করার সুফল বর্ণিত হয়েছে। মনসাদেবীর পূজার সময় উপাখ্যানগুলো শোনানো হয়। এরূপ উপাখ্যান অবলম্বনে অনেক পালাগানও রচিত হয়েছে। 'মনসার ভাসান' এ রকম একটি পালাগান। এ ছাড়াও মনসাপূজার মাধ্যমে হিন্দুধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বিভিন্ন সাপ সম্পর্কে ধারণা গ্রহণের সুযোগ ঘটে। বিষধর সাপের প্রকোপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ফলে সর্পদংশনের ঘটনা কম ঘটে। এ পূজার মূল শিক্ষা হলো সর্পকে বশীভূতকরণের কৌশল আয়ত্ত করা, যার মাধ্যমে শত্রুকে সুপথে ফিরিয়ে এনে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায়।

একক কাজঃ মনসাদেবীর পূজার সুফলগুলো লেখো।

নতুন শব্দঃ প্রজ্বলিত, জগদ্‌গৌরী, নাগপঞ্চমী, কদ্রু।

পাঠ ৬ : নারায়ণদেবের পরিচয় ও পূজাপদ্ধতি

নারায়ণদেবের পরিচয়

বিষ্ণুর সহস্র নামের মধ্যে ২৪৫তম নাম নারায়ণ। হিন্দুধর্ম অনুসারে নারায়ণ পরমব্রহ্ম, পরমাত্মা ও পরমেশ্বর নামে পরিচিত। 'নার' বা 'নারা' শব্দের অর্থ মানুষ এবং 'অয়ন' শব্দের অর্থ আশ্রয়। সুতরাং 'নারায়ণ' শব্দের অর্থ সকল মানুষ বা সকল জীবের আশ্রয়স্থল। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা ও পুরাণ অনুসারে নারায়ণকে সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

হিন্দুধর্মগ্রন্থ অনুসারে ভগবান বিষ্ণু শ্যামবর্ণ। তাঁর চার হাত। এক হাতে পদ্ম, এক হাতে শঙ্খ, এক হাতে চক্র এবং আর এক হাতে রয়েছে গদা। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা অনুসারে তিনি বিশ্বরূপ। তাঁর সহধর্মিণীর নাম দেবী লক্ষ্মী। এই বিষ্ণুই নারায়ণ বা হরি। তিনি এ বিশ্বের পালনকর্তা। তাঁর বাহন গরুড়।

নারায়ণপূজার উদ্দেশ্য: ভগবান নারায়ণ সকল জীবের আশ্রয়স্থল। নারায়ণপূজার মুখ্য উদ্দেশ্য নারায়ণের আশীর্বাদ লাভ এবং তাঁর কৃপায় পারিবারিক সুখ-শান্তি অর্জন করা।

সময়কাল: যেকোনো সময় বা মাসে নারায়ণপূজা করা যায়। তবে বৈশাখ মাসে নারায়ণপূজার প্রচলন অধিক লক্ষ করা যায়।

পূজাপদ্ধতি

প্রতিমারূপে, শালগ্রাম শিলারূপে, তাম্রপাত্রে বা জলে নারায়ণপূজা করা হয়। শালগ্রাম শিলা এক প্রকার সামুদ্রিক জীবাশ্ম, যা ভারতের গণ্ডকী নদীর তীরে শালগ্রাম নামক গ্রামে পাওয়া যায়। এই জীবাশ্মটি গোল ও কালো রঙের হয়ে থাকে। এই শিলাকে নারায়ণচক্রও বলা হয়। নারায়ণপূজায় অন্যান্য পূজার মতোই সাধারণ পূজাবিধি অনুসরণ করতে হয়। তারপর বিশেষভাবে নির্ধারিত মন্ত্রে নারায়ণের পূজা করা হয়। সাধারণত নারায়ণপূজার জন্য সাদা ফুলের প্রয়োজন হয়। তুলসীপাতা নারায়ণের প্রিয়।

পাঠ ৭ : নারায়ণের প্রণামমন্ত্র এবং নারায়ণপূজার শিক্ষা ও প্রভাব

নারায়ণের প্রণামমন্ত্র

ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।

জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

সরলার্থ: নারায়ণ ব্রহ্মণ্যদেব। তিনি কৃষ্ণ, তিনি গোবিন্দ। তিনি পৃথিবী, ব্রাহ্মণ ও জগতের হিতসাধন করেন। তাঁকে বারবার নমস্কার জানাই।

নারায়ণপূজার শিক্ষা ও প্রভাব

নারায়ণ পালনের দেবতা। তাই নারায়ণদেবের কাছ থেকে আমরা আমাদের সন্তান-সন্ততি তথা সকল জীবকে দায়িত্বের সঙ্গে পালন করার শিক্ষা পাই।

নারায়ণকে স্মরণ করলে পাপ দূর হয়। হৃদয় পবিত্র হয়। মনে শক্তির সঞ্চার হয়। নারায়ণ আমাদের প্রতিপালনকারী দেবতা। তিনি আমাদের দেহের মধ্যে আত্মারূপে বিরাজ করেন। নারায়ণপূজার মাধ্যমে ভক্তেরা ভগবান নারায়ণের আশীর্বাদ লাভ করেন। তাঁর আশীর্বাদ ভক্তদের দৈনন্দিন জীবনকে সুখ ও সমৃদ্ধিতে ভরে তোলে। নারায়ণপূজার ফলে মানুষের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ভক্তগণ শান্তির জন্য পরম শ্রদ্ধাভরে ভগবান নারায়ণের উপাসনা করেন এবং তাঁর মহিমা কীর্তন করেন।

একক কাজঃ নারায়ণপূজার পাঁচটি প্রভাব লেখো।

নতুন শব্দঃ শালগ্রাম শিলা, গণ্ডকী, জীবাশ্ম, তাম্রপাত্র।

পাঠ ৮ : শনিদেবের পরিচয় ও পূজাপদ্ধতি

শনিদেবের পরিচয়

হিন্দুধর্মে অন্যান্য দেবতার মতো শনিদেবও একজন উপাস্য দেবতা। তিনি সূর্য ও ছায়ার পুত্র এবং নবগ্রহের অন্যতম। জীবনে চলার ক্ষেত্রে যেসব বাধা-বিপত্তি আসে, শনিদেব তা দূর করেন। তাই হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা বাধা-বিপত্তির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য শনিদেবের পূজা করেন।

শনিদেবের চার হাত। তাঁর গায়ের রং কালো এবং পোশাকও কালো। তাঁর হাতে তরবারি, তীর ও ধনুক দেখা যায়। তাঁর বাহন শকুন।

শনিদেবের পূজা

সময়কালঃ শনি দেবতার নাম অনুসারে শনিবারে তাঁর পূজা করা হয়।

শনিপূজার উদ্দেশ্য: শনিপূজার উদ্দেশ্য হলো শনিদেবকে সন্তুষ্ট রাখা, বিভিন্ন ধরনের রোগ-পীড়া থেকে মুক্ত থাকা এবং মনের শান্তি বজায় রাখা ।

শনিদেবের পূজাপদ্ধতি

সাধারণত মন্দিরে বা পারিবারিক পর্যায়ে সূর্যাস্তের পরে শনিপূজা করা হয়। অন্যান্য পূজার মতো সকল ধরনের বিধি-বিধান অনুসরণ করা হয় । পারিবারিক পর্যায়ে শনিপূজার ক্ষেত্রে বাড়ির আঙিনাকে বেছে নেয়া হয়। গৃহের অভ্যন্তরে শনিপূজা করা হয় না। পূজায় মন্ত্র ও শনিদেবের পাঁচালি পাঠ করা হয় । পাড়া-প্রতিবেশীদের পূজা অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয় । শনিপূজায় ভোগ হিসেবে পাঁচ প্রকারের ঋতুভিত্তিক ফল এবং পাঁচ রকমের ফুল নিবেদন করা হয় । কোনো কোনো অঞ্চলে খিচুড়ি, দুধ, চিনি, বাতাসা, কলা, গুড়, মিষ্টান্ন ও ময়দার প্রসাদ তৈরি করা হয় । খিচুড়ি প্রস্তুতের ক্ষেত্রে মুগের ডাল ব্যবহার করতে হয় । এ ছাড়াও পূজার উপকরণ হিসেবে পান-সুপারি, মধু, মাসকলাই, কালো তিল, বেগুনি বা কালো রঙের ফুলের প্রয়োজন হয় । শনি পূজা শেষে প্রসাদ বিতরণ করা হয় ।

পাঠ ৯ : শনিদেবের প্রণামমন্ত্র এবং শনিপূজার শিক্ষা ও প্রভাব

শনিদেবের প্রণামমন্ত্র

ওঁ নীলাঞ্জনচয়প্রখ্যং রবিসূতমহাগ্রহম্ ।
ছায়ায়া গর্ভসম্ভূতং ত্বং নমামি শনৈশ্চরম্ ॥

সরলার্থ: তোমার দেহ নীলবর্ণ, তুমি সূর্যদেবতার পুত্র, ছায়ার গর্ভে তোমার জন্ম, তোমাকে আমি নমস্কার জানাই ।

শনিপূজার শিক্ষা ও প্রভাব

শনিদেবের পূজা করলে আমাদের আপদ-বিপদ দূর হয়। আমাদের দায়িত্বহীনতা, অপবিত্রতা ও পাপের কারণে শনিদেব খুব রুষ্ট হন। তখন আমরা কষ্ট পাই। কষ্টের মধ্য দিয়ে আমাদের উপলব্ধি ঘটে। আমরা তখন দায়িত্বশীলতা ও পবিত্রতার প্রতি মনোযোগী হই। মা যেমন সন্তানকে গভীর ভালোবাসা সত্ত্বেও সংশোধনের জন্য শাস্তি দেন, তেমনি শনিদেবও কখনো-কখনো আমাদের কষ্ট দিয়ে সংশোধন করেন এবং অধর্মের পথ থেকে ধর্মপথে ফিরিয়ে আনেন। তাই প্রতি সপ্তাহে শনিবার শনিপূজা করা হিন্দুদের একটি নিয়মিত ধর্মকৃত্য।

দলীয় কাজঃ শনিদেবের পূজায় ব্যবহৃত উপচারের একটি তালিকা তৈরি করো।

নতুন শব্দঃ নবগ্রহ, পাঁচালি, কৃষ্ণবর্ণ।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্নঃ

১. মনসাপূজা করা হয় কোন তিথিতে?

ক. শ্রী পঞ্চমী খ.কৃষ্ণা পঞ্চমী

গ. কৃষ্ণা ত্রয়োদশী ঘ.শুক্লা অষ্টমী

২. দেব-দেবীর পূজায় পবিত্র ধ্বনি সৃষ্টির তাৎপর্য কী?

ক. এটির মাধ্যমে স্রষ্টার কাছে নত হওয়া যায়

খ. এটাকে জন্মদাত্রী বা ধরণির মনে করা হয়।

গ. এটি জীবনের আলোকে নির্দেশ করে

ঘ. এতে আমাদের ইচ্ছাসমূহ নিয়ন্ত্রিত হয়

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও

শ্রাবণীদের বাড়িতে সুখ শান্তি লাভের জন্য প্রতিবার বছরের প্রথম মাসে এক পূজার আয়োজন করা হয়ে থাকে। ঐ দেবতার পূজায় একটি কালো রঙের জীবাশ্ম ব্যবহার করা হয়। সে আগ্রহভরে ঐ দিনটির অপেক্ষায় থাকে এবং নিষ্ঠাভরে পূজা করে থাকে । কিন্তু ওর বন্ধু অরনি জানায় সে কখনও নিজে পূজা করেনি। এক শনিবার তার মা শারীরিকভাবে অসুস্থ থাকায় তাকে সূর্যাস্তের পরে একটি বিশেষ পূজার আয়োজন করতে বললেন। অরণী তিন রকম ফল, মিষ্টি এবং বিভিন্ন উপচার সহকারে ঘরের বারান্দায় পাঁচালি পড়ে পূজা সম্পন্ন করে উপস্থিত সকলের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করে।কিন্তু পূজার নিয়ম ঠিকঠাক না হওয়ায় এটা নিয়ে তার মা দুশ্চিন্তায় ভোগে।

৩. শ্রাবণীদের বাড়িতে কোন দেবতার পূজা হয়ে থাকে?

ক. নারায়ণ

খ. মনসাদেবী

গ. শনিদেব

ঘ. দূর্গা দেবী

৪. অরনি যে পূজাটি করেছিল তা সঠিকভাবে করতে হলে –

i. বাড়ির উঠানে করতে হতো

ii. আসনে একটি কালে রঙের জীবাশ্ম রাখতে হতো।

iii. পাঁচ রকমের ফল দিতে হতো

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i,ii ও iii

২০২৬

সৃজনশীল প্রশ্ন :

দৃশ্যপট ১

দৃশ্যপট ২

তন্ময়দের গ্রামে আষাঢ় মাসের একটি নির্দিষ্ট তিথিতে উঠানে একটি গাছ লাগিয়ে একজন দেবতার পূজা করা হয়। এ পূজার ফলে বিরোধী লোকদের নিজেদের দলে আনা সম্ভব হয় বলে মনে করা হয়। এই পূজাকে কেন্দ্র করে তাদের এলাকার প্রতিটি বাড়িতে জন্য নানা উৎসব ও পারিবারিক আয়োজন হয়।

ক.নারায়ণদেবের পরিচয় দাও।

খ.পূজায় পবিত্র জল ব্যবহার করা হয় কেন তা ব্যাখ্যা করো।

গ.দৃশ্যপট ১ এর ছবিটি পূজার সাথে কীভাবে সম্পর্কিত তা ব্যাখ্যা করো।

ঘ.তন্ময়দের বাড়িতে কোন পূজার আয়োজন করা হয়? তার শিক্ষা ও প্রভাব তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. দেব-দেবীর পূজায় নৈবেদ্য কেন ব্যবহার করা হয়?

২. শনিদেবের পূজা কী উপায়ে করা হয়? ব্যাখ্যা করো।

৩.পূজার উপকরণ হিসেবে পানসুপারি ব্যবহার করা হয় কেন?

২০২৫

ষষ্ঠ অধ্যায়

ধর্মীয় উপাখ্যানে নৈতিক শিক্ষা

নীতিসম্পর্কিত শিক্ষাকে নৈতিক শিক্ষা বলে। নীতি বা নৈতিকতা ধর্মের অঙ্গ। তাই নৈতিক শিক্ষাও ধর্মের অঙ্গ। যত শিক্ষাই গ্রহণ করা হোক-না-কেন, যদি নৈতিকতা অর্জিত না হয়, তাহলে সে শিক্ষা মূল্যহীন।

হিন্দু ধর্মবিষয়ক গ্রন্থসমূহে উপাখ্যানের মধ্য দিয়েও নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে আমরা দেশপ্রেম ও নৈতিক গুণের ধারণা, উক্ত বিষয়ে ধর্মীয় উপাখ্যান এবং ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে দেশপ্রেম ও অধ্যবসায়ের গুরুত্ব সম্পর্কে জানব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- দেশপ্রেম ও অধ্যবসায় ধারণা দুটি ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ধর্মগ্রন্থ থেকে দেশপ্রেম ও অধ্যবসায়ের দৃষ্টান্তমূলক উপাখ্যান বর্ণনা করতে পারব;
- উপাখ্যানে বর্ণিত ঘটনার নৈতিক শিক্ষা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে দেশপ্রেম ও অধ্যবসায়ের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- দেশপ্রেম ও অধ্যবসায়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করে নিজ আচরণে তার প্রতিফলন ঘটাতে পারব।

২০২৬

পাঠ ১ : দেশপ্রেম

দেশপ্রেম বলতে বোঝায় দেশের প্রতি ভালোবাসা। মানুষ যেদেশে জন্মগ্রহণ করে, তার মাটি-জল-আলো-বাতাস তার দেহকে পুষ্ট করে, তাকে বাঁচিয়ে রাখে। বড় হয়ে মানুষ তার মাতৃভূমির প্রতি মমত্ব অনুভব করে। মাতৃভূমির প্রতি এই মমত্ববোধই দেশপ্রেম। দেশ ও জাতির মঙ্গলের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার নামই দেশপ্রেম। দেশপ্রেম ধর্মের অঙ্গ। ধর্মগ্রন্থে বলা হয়েছে—**'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।'** অর্থাৎ জননী ও জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। তাই যিনি দেশপ্রেমিক, তিনি দেশের স্বার্থকে ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে স্থান দেন। তিনি সবসময় দেশ ও দেশবাসীর কল্যাণের জন্য কাজ করেন। দেশের কোনো বিপদে দেশপ্রেমিক কখনো নীরব থাকতে পারেন না। নিজের জীবনের বিনিময়েও তিনি সে বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়েন। দেশের মঙ্গলের জন্য প্রয়োজন হলে নিজের জীবন বিসর্জন দিতেও দ্বিধাবোধ করেন না। দেশপ্রেম মানবজীবনের একটি মহৎ গুণ। পৃথিবীতে যত মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন, সকলেই ছিলেন দেশপ্রেমিক।

পৌরাণিক যুগে জনা, বিদুলা, কার্তবীর্যার্জুন প্রমুখ দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছেন। একালে এ মহাদেশে মহাত্মা গান্ধী, ক্ষুদিরাম, মাস্টারদা সূর্যসেন, প্রীতিলতা, রাণী রাসমণি, চিত্তরঞ্জন দাস, বাঘা যতীন, রফিক, সালাম, বরকত, জব্বার, আরও অনেকের নাম উল্লেখ করা যায়, যাঁরা দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছেন। দেশ ও জাতির জন্য তাঁদের অবদান স্বর্ণাক্ষরে ইতিহাসের পাতায় লেখা রয়েছে। মানুষ তাঁদের স্মরণ করে, তাঁদের প্রদর্শিত পথে চলতে চেষ্টা করে।

একক কাজ: তোমার জানা একজন দেশপ্রেমিকের অবদান সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখো।

নতুন শব্দ: মমত্ববোধ, স্বর্গাদপি, গরীয়সী, বিসর্জন, স্বর্ণাক্ষর, প্রদর্শিত।

পাঠ ২ ও ৩ : কার্তবীর্যার্জুনের দেশপ্রেম

প্রাচীনকালে চন্দ্রবংশীয় এক রাজা ছিলেন। তাঁর নাম কার্তবীর্যার্জুন। তিনি ছিলেন যেমন কর্তব্যপরায়ণ, তেমনি বীর ও দেশপ্রেমিক। রাজকার্যের ক্লান্তি দূর করার জন্য তিনি একবার রাজধানীর বাইরে অবকাশ যাপন করছিলেন।

গুপ্তচরের মুখে এ খবর পেয়ে লঙ্কার রাজা রাবণ সুযোগ বুঝে তাঁর রাজ্য আক্রমণ করলেন। কার্তবীর্যার্জুনের এক সেনানায়কের নেতৃত্বে ঘোর যুদ্ধ শুরু হলো। এরই মধ্যে সংবাদ পৌঁছানো হলো মহারাজ কার্তবীর্যার্জুনের কাছে। শুনে মহারাজ ক্রোধে আগুনের মতো জ্বলে উঠলেন: কী! আমার রাজ্য আক্রান্ত! আমার মাতৃভূমি শত্রুর বিষাক্ত নিঃশ্বাসে বিপর্যস্ত! আমি এখনই যুদ্ধে যাব।

একথা ভেবে রাজা কার্তবীর্যার্জুন অবকাশ যাপন স্থগিত করে সোজা যুদ্ধক্ষেত্রে চলে গেলেন। ভীষণ যুদ্ধ শুরু হলো।

২০২৩

একপক্ষ আক্রমণকারী। আরেক পক্ষ আক্রান্ত, কিন্তু দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ। পরাজিত হলে দেশ হবে পরাধীন। তাই সৈন্যগণ কার্তবীর্যার্জুনের নেতৃত্বে প্রাণপণ যুদ্ধ করতে লাগল। অবশেষে জয় হলো কার্তবীর্যার্জুনের। রাবণ পরাজিত হয়ে বন্দি হলেন। স্বর্গে এই বার্তা পৌঁছে গেল। কথাটা মহামুনি পুলস্ত্যের কানে গেল। এ সময় তিনি স্বর্গলোকে ছিলেন। রাবণ পুলস্ত্যের নাতি। তাই তাঁর খুব দুঃখ হলো। তিনি স্বর্গ থেকে চলে এলেন কার্তবীর্যার্জুনের রাজসভায়। কার্তবীর্যার্জুন পুলস্ত্যকে দেখে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে বললেন, 'কী সৌভাগ্য আমার, মেঘ না চাইতেই জল।' এই বলে তিনি পুলস্ত্যকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন।

কার্তবীর্যার্জুনের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে পুলস্ত্য মুনি বললেন, তুমি দেবতাদের প্রিয়। ত্রিভুবন তোমার যশকীর্তনে মুখরিত। রাবণ আমার নাতি। তাকে পরাজিত করে তুমি বন্দি করে কারাগারে রেখেছ। আমি তার মুক্তি চাই, বৎস।

কার্তবীর্যার্জুন বললেন, 'রাবণ আমার রাজ্য আক্রমণ করেছিল। আমার দেশপ্রেমিক যোদ্ধারা তাকে প্রতিহত করেছে।'

শুনে পুলস্ত্য বললেন, 'তোমার গভীর দেশপ্রেম আর বীরত্বের কাছে রাবণ পরাজিত হয়েছে।'

কার্তবীর্যার্জুন বললেন, 'আপনি পরম শ্রদ্ধেয়। আপনি যখন রাবণের মুক্তি চাইছেন, তখন তাকে মুক্তি দিয়ে আমি ধন্য হতে চাই।'

রাবণ মুক্তি পেলেন।

রাবণ তাঁর অপরাধ স্বীকার করলেন এবং অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে রইলেন।

পুলস্ত্য বললেন, 'তোমাদের উভয়ের কল্যাণ হোক।'

পুলস্ত্যের মাধ্যমে অগ্নিসাক্ষী করে কার্তবীর্যার্জুনের সাথে রাবণের মৈত্রী স্থাপিত হলো। পুলস্ত্য বিদায় চাইলেন তাঁদের কাছে। কার্তবীর্যার্জুন আর রাবণ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বিদায় জানালেন মহামুনি পুলস্ত্যকে।

পুলস্ত্য চলে গেলেন স্বর্গে। রাবণ ফিরে গেলেন তাঁর নিজের রাজ্যে।

কার্তবীর্যার্জুন চেয়ে রইলেন তাঁদের গমন পথের দিকে। তাঁর চোখে পড়ল শ্যামল প্রান্তর। এই তাঁর দেশ, তাঁর স্বাধীন রাজ্য। আনন্দে-আবেগে ভরে উঠল কার্তবীর্যার্জুনের হৃদয়।

উপাখ্যানের শিক্ষা: দেশের স্বাধীনতার জন্য স্বার্থত্যাগ করে যাঁরা যুদ্ধ করেন, তাঁরা দেশপ্রেমিক।

দলীয় কাজ: কার্তবীর্যাজুনের দেশপ্রেম উপাখ্যানের শিক্ষার প্রায়োগিক দিক চিহ্নিত করো।

নতুন শব্দ: কার্তবীর্যার্জুন, গুপ্তচর, অবকাশ, উদ্বুদ্ধ, বার্তা, পুলস্ত্য, সাষ্টাঙ্গ।

পাঠ ৪ : সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে দেশপ্রেমের গুরুত্ব

দেশপ্রেম ধর্মের অঙ্গ। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ মানুষ দেশ ও সমাজের মঙ্গলের জন্য স্বার্থচিন্তার ওপরে উঠে পরের হিতার্থে কাজ করেন। এটাই তাঁর জীবনের ব্রত। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে মানুষ তাঁর ধন-জন এমনকি জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতে দ্বিধাবোধ করেন না। দেশের যখন সংকটকাল উপস্থিত হয়, দেশ যখন বহিঃশত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হয়, দেশের স্বাধীনতা যখন বিপর্যস্ত হয়, যখন পরাধীনতা মানুষকে শৃঙ্খলিত করতে চায়, যখন বিদেশি শাসক দেশ ও জাতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়, তখনই মানুষ দেশপ্রেমের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং দেশের মর্যাদা রক্ষায় অকাতরে জীবন বিসর্জন দেন।

স্বাধীন চিন্তা ও জাতীয়তাবোধ হলো দেশপ্রেমের প্রধান উৎস। স্বাধীনতার জন্য কত বীরের আত্মবলিদানে স্বদেশের মাটি হয় রক্তে রঞ্জিত। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস তো দেশপ্রেমের এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। দেশপ্রেমের অগ্নিমন্ত্রই লক্ষলক্ষ বাঙালিকে তাঁদের জীবন উৎসর্গ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

স্বদেশের যেকোনো গৌরবে দেশপ্রেমিকমাত্রই গর্ববোধ করেন। তেমনি দেশের দুর্দিনে শঙ্কিত চিত্তে উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং নিঃশর্তে আত্মত্যাগ করতেও কুণ্ঠিত হন না। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় নির্দ্বিধায় জীবনকে উৎসর্গ করেন। যুগেযুগে দেশপ্রেমিকগণ দেশের জন্য, সমাজের মঙ্গলের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করার মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। হিন্দু ধর্মগ্রন্থে দেশপ্রেমকে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

শুধু বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করাই নয়, দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ করাও দেশপ্রেম। দেশের সম্পদ রক্ষা করাও দেশপ্রেম। দেশের উন্নতির জন্য দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করার মধ্য দিয়েও দেশপ্রেমের প্রকাশ ঘটে। রাষ্ট্র যাতে সঠিকভাবে শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে পরিচালিত হয়, সেজন্য যোগ্য নাগরিক হিসেবে দেশপ্রেমিক বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। নিজের দেশের কল্যাণের জন্য দক্ষ নাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে হয়। কেবল নিজের বা নিজের পরিবারের স্বার্থ দেখলেই চলে না, সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণের কথাও ভাবতে হয়। সমাজ তথা রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য সদা সচেষ্ট থাকতে হয়। এর নামও দেশপ্রেম। ত্যাগ ও তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে দেশপ্রেম নামক

২০২৬

নৈতিক গুণটি অর্জন করতে হয়।

দেশপ্রেম মানুষকে উদার করে, দেশের মানুষকে ভালোবাসতে উদ্বুদ্ধ করে, আত্মসুখ বিসর্জন দেওয়ার প্রেরণা দান করে। দেশপ্রেম মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। যার মধ্যে দেশপ্রেম নেই তাকে যথার্থ মানুষ বলা যায় না। আত্মকেন্দ্রিক মানুষ কখনো দেশপ্রেমিক হতে পারে না। দেশপ্রেমিক দেশের সম্পদ, দেশের স্বার্থ, দেশের মর্যাদা প্রভৃতিকে নিজের সম্পদ, নিজের স্বার্থ ও নিজের মর্যাদা বলে মনে করেন। তাই তাঁরা দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য, দেশের মর্যাদা রক্ষার জন্য আত্মোৎসর্গ করতেও পিছপা হন না। শাস্ত্রমতে, দেশের মর্যাদা রক্ষা করতে যুদ্ধে শহিদ হলে অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়।

পরাধীনতা ব্যক্তিকে শৃঙ্খলিত করে রাখে। সমাজের অগ্রগতি তাতে ব্যাহত হয়। রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে পরাধীন ব্যক্তির কোনো ভূমিকা থাকে না। তাই রাষ্ট্রীয় জীবনে দেশপ্রেমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সুতরাং আমরা দেশপ্রেমিক হব এবং দেশের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকব। দেশের জন্য, দেশের মানুষের মঙ্গলের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করতেও কুণ্ঠিত হব না।

একক কাজঃ সমাজ ও স্বদেশের জন্য তোমার করণীয় সম্পর্কে লেখো।

নতুন শব্দঃ হিতার্থ, উৎসর্গ, শৃঙ্খলিত, আত্মবলিদান।

পাঠ ৫ : অধ্যবসায়

কোনো লক্ষ্য অর্জনে বিশেষ যত্নসহকারে কঠোর সাধনার মধ্য দিয়ে বারবার চেষ্টা করার নামই অধ্যবসায়। অধ্যবসায় হচ্ছে কতিপয় গুণের সমষ্টি। চেষ্টা, উদ্যোগ, আন্তরিকতা, পরিশ্রম, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, একাগ্রতা ইত্যাদি গুণের সমন্বয়ে অধ্যবসায় নামক নৈতিক গুণটি গড়ে ওঠে। কঠোর পরিশ্রম আর ধৈর্যের মধ্য দিয়ে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর মধ্যেই অধ্যবসায়ের সার্থকতা নিহিত। অধ্যবসায়ের গুণেই মানুষ বড় হয়। অসাধ্য সাধন করতে পারে। অধ্যবসায় ধর্মেরও অঙ্গ। ধর্মগ্রন্থে অধ্যবসায়কে একটি বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

ছাত্রজীবনে অধ্যবসায়ের গুরুত্ব সর্বাধিক। ছাত্রজীবন আর অধ্যবসায় একই সূত্রে গাঁথা। বিদ্যার্জনের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। অলস, কর্মবিমুখ ও হতাশ শিক্ষার্থী কখনো বিদ্যালাভে সফল হতে পারে না। একজন অধ্যবসায়ী শিক্ষার্থী অল্প মেধাসম্পন্ন হলেও তার পক্ষে সাফল্য অর্জন করা কঠিন নয়। কাজেই অকৃতকার্য শিক্ষার্থীকে হতাশ না হয়ে পুনরায় দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে অধ্যবসায়ে মনোনিবেশ করা উচিত। যেব্যক্তি অধ্যবসায়ী নয়, সে জীবনের কোনো সাধারণ কাজেও সফলতা লাভ করতে পারে না।

জীবনের সফলতা এবং বিফলতা অনেকাংশে অধ্যবসায়ের ওপরই নির্ভর করে। মনে রাখতে হবে, জীবনসংগ্রামে সাফল্য লাভের মূলমন্ত্র হচ্ছে অধ্যবসায়। শুধু অধ্যবসায়ের বলেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসু, কাজী নজরুল ইসলাম, নেপোলিয়ন বোনাপার্ট, রবার্ট ব্রুস প্রমুখ মনীষী জগতে বিখ্যাত হয়ে আছেন। তাই আমাদের সকলেরই উচিত অধ্যবসায়ের মতো মহৎ গুণটি আয়ত্ত করা।

দলীয় কাজঃ অধ্যবসায় গুণটির প্রভাব লিখে একটি পোস্টার তৈরি করো।

নতুন শব্দঃ সহিষ্ণুতা, মনোনিবেশ, কুসুমাস্তীর্ণ।

পাঠ ৬ : অধ্যবসায়ী একলব্য

অনেককাল আগের কথা। তখন হস্তিনাপুরের কাছে এক গভীর অরণ্য ছিল। সেখানে বাস করতেন নিষাদদের রাজা হিরণ্যধনু। তাঁর পুত্র একলব্য। একলব্যের ইচ্ছে হলো, হস্তিনাপুরে গিয়ে অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যের কাছ থেকে অস্ত্রবিদ্যা শিখবেন।

সে সময়ে হস্তিনাপুরের রাজা ছিলেন ধৃতরাষ্ট্র। যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব এই পাণ্ডুপুত্রগণ এবং দুর্যোধন, দুঃশাসনসহ ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রকে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিতেন দ্রোণাচার্য। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের বলা হয় কৌরব আর পাণ্ডুর পুত্রদের বলা হয় পাণ্ডব।

একদিন দ্রোণাচার্য কৌরব এবং পাণ্ডবদের অস্ত্রশিক্ষা দিচ্ছেন। এমন সময় সেখানে একলব্য এসে উপস্থিত। তাঁর কাঁধে ধনুক, হাতে তীর, মাথায় পাখির পালক আর পরনে বল্কল। তিনি দ্রোণাচার্যকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বললেন, 'গুরুদেব, আমি আপনার নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিখতে চাই।'

দ্রোণাচার্য তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার পরিচয় কী, বৎস?'

একলব্য বললেন, 'আমি নিষাদ বংশীয়। লোকে আমাদের ব্যাধ বলে। এখান থেকে দূরে অরণ্যে আমাদের বাস।' দ্রোণাচার্য বললেন, 'বৎস, এখানে আমি শুধু রাজপুত্রদের অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিই। তোমাকে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

একথা শুনে একলব্য ভীষণভাবে দুঃখিত ও মর্মাহত হলেন। মনের দুঃখে তিনি বনে ফিরে গেলেন। গভীর বনে প্রবেশ করে একলব্য লতা-পাতা দিয়ে একটি কুটির নির্মাণ করলেন। তারপর তিনি মাটি দিয়ে দ্রোণাচার্যের একটি মূর্তি নির্মাণ করলেন। দ্রোণাচার্যকে মনেমনে গুরু মেনে তাঁর মূর্তির সম্মুখে তিনি অহর্নিশ তীর-ধনুক নিয়ে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করতে লাগলেন। কঠোর অধ্যবসায়, নিরলস পরিশ্রম আর ক্রমাগত অনুশীলনের দ্বারা তিনি ধনুর্বিদ্যার প্রায় সকল কলাকৌশল আয়ত্ত করে ফেললেন।

২০২৬

এ সময়ে একদিন অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য কৌরব ও পাণ্ডবদের নিয়ে তাঁদের অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার পরীক্ষা নিতে গভীর বনে গেলেন। সেখানে ছাউনি ফেলে অবস্থান করছেন। তাঁদের সঙ্গে ছিল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একটি কুকুর। অপরিচিত কাউকে দেখলেই কুকুরটি উচ্চস্বরে ঘেউ ঘেউ শব্দ করে চিৎকার করত।

তাঁদের শিবিরের অল্প দূরেই ছিল একলব্যের সাধনার স্থান। একলব্য গভীর মনোনিবেশে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষায় ব্যস্ত। এমন সময় কুকুরটি সেখানে এসে উচ্চস্বরে ঘেউ ঘেউ করে চিৎকার করতে লাগল। একলব্যের সাধনা ভেঙে গেল। তিনি সাতটি বাণ নিক্ষেপ করে কুকুরটির মুখ বন্ধ করে দিলেন। সে অবস্থায় কুকুরটি দ্রোণাচার্যের ছাউনিতে ফিরে গেল। তখন উপস্থিত সকলেই লক্ষ করলেন কুকুরটি আর শব্দ করছে না। যুধিষ্ঠির কুকুরটির মুখ পরীক্ষা করে দেখলেন কেউ বাণ নিক্ষেপ করে কুকুরটিকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। তাঁরা সকলেই বিস্মিত হলেন। কুকুরটির পেছন পেছন তাঁরা পৌঁছে গেলেন একলব্যের কাছে এবং ফিরে এসে তাঁর কথা দ্রোণাচার্যকে জানালেন। দ্রোণাচার্যও বিস্মিত হলেন। তিনি চিন্তা করলেন, ধনুর্বিদ্যার এ কৌশল তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না। অথচ কুকুরটিকে সেই কৌশলেই স্তব্ধ করা হয়েছে।

দ্রোণাচার্য অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে ছাউনি থেকে বেরিয়ে পড়লেন। একলব্যের কুটিরের সম্মুখে এসে দেখলেন, এক ব্যাধ-যুবক একাগ্রমনে তীর-ধনুক নিয়ে অনুশীলন করছেন। তাঁর পেছনে দ্রোণাচার্যের মাটির মূর্তি। দ্রোণাচার্যের উপস্থিতি টের পেয়ে একলব্য তাঁর তীর-ধনুক মাটিতে রেখে এগিয়ে গেলেন গুরুর কাছে। তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে একলব্য বললেন, 'গুরুদেব, আমি আপনার শিষ্য। আদেশ করুন, আমি আপনার জন্য কী করতে পারি।'

দ্রোণাচার্য তাঁকে বললেন, 'বৎস, তুমি এ বিদ্যা কোথা থেকে শিখেছ?'

২০২৬

একলব্য কৃতজ্ঞ চিত্তে বললেন, 'আমি আপনাকে মনে-মনে গুরুপদে বরণ করে আপনার এই মূর্তি সামনে রেখে আপনার কাছ থেকেই এ-সকল কলাকৌশল শিক্ষা করেছি— নিজের অধ্যবসায় আর নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে।' দ্রোণাচার্য বিস্মিত হলেন। অর্জুনও বিস্মিত হয়ে মৌনমুখে দাঁড়িয়ে রইলেন।

কোনো অস্ত্রগুরুর কাছে না শিখে নিজে নিজে গভীর অধ্যবসায়ে এমন অস্ত্রবিদ্যাশিক্ষা সহজ কথা নয়।

উপাখ্যানের শিক্ষা: অধ্যবসায় দ্বারা যেকোনো কাজে সাফল্য অর্জন করা যায়। অধ্যবসায়ীর কাছে কোনো কিছুই অসম্ভব নয়।

একক কাজ: অধ্যবসায়ের শিক্ষা তোমরা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করে দেখাও।

নতুন শব্দ: একলব্য, দ্রোণাচার্য, হিরণ্যধনু, নিরলস, স্তব্ধ।

পাঠ ৭ : ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে অধ্যবসায়ের গুরুত্ব

ব্যক্তিসমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের জন্য অধ্যবসায় একটি অবিচ্ছেদ্য নৈতিক গুণ।

ব্যক্তি-জীবনে অধ্যবসায়ের গুরুত্ব অপরিসীম। অধ্যবসায় ছাড়া শিক্ষা আত্মস্থ হয় না। তাই শিক্ষালাভ ও চরিত্র গঠনে অধ্যবসায় অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

মানুষ সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করে। সমাজের প্রতি তার বেশ কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। সমাজের সকলেই যদি স্ব-স্ব দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে তাহলে সমাজে ও রাষ্ট্রে কোনো হানাহানি থাকবে না, থাকবে না কোনো বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি। কিন্তু মুখে বললেই নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা হয় না। এর জন্য চাই কাজের প্রতি একাগ্রতা, ধৈর্য, দায়িত্বশীলতা ও কর্তব্যপরায়ণতা। আর এ গুণাবলির সমন্বয়ে যে বিশেষ নৈতিক গুণ মানুষের মধ্যে জাগ্রত হয় তাকে বলে অধ্যবসায়। অধ্যবসায়ই মানুষকে উন্নতির শিখরে আরোহণ করতে সাহায্য করে। অধ্যবসায়ের গুণেই মানুষ অনেক অসাধ্য সাধন করেছে। অধ্যবসায় ছাড়া কেউ কখনো উন্নতি করতে পারে না, কোনো জাতি তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না।

সভ্যতার শিখরে অধিষ্ঠিত আজকের বিশ্ব মানুষের দীর্ঘদিনের অধ্যবসায়ের পরিণতি। বর্তমান সভ্যতার ইতিহাস নিরন্তর অধ্যবসায়ের ইতিহাস। মনীষীগণ সারাজীবন সাধনা করে মানব সভ্যতার উৎকর্ষ সাধন করেছেন। মানুষের অধ্যবসায় না থাকলে সভ্যতার এই অগ্রগতি সম্ভব হতো না।

অধ্যবসায়ের যথার্থ কার্যকারিতার জন্যই জীবনের পথে সকল বাধা অতিক্রম করা মানুষের পক্ষে সম্ভবপর হয়েছে। মানুষের জীবনে যে চিরায়ত সংগ্রামী শক্তি নিহিত আছে, তার বহিঃপ্রকাশই হচ্ছে অধ্যবসায়। এই অধ্যবসায়ই মানুষকে করে তোলে সংগ্রামী, উদ্যোগী আর কর্তব্যপরায়ণ। নিজের অসহায়ত্ব উপেক্ষা করে অধ্যবসায়ের প্রয়োগে মানুষ হয় স্বনির্ভর।

২০২৬

অধ্যবসায় একটি মহৎ গুণ। জাতীয় জীবন মর্যাদাবান হয়ে ওঠে অধ্যবসায়ের এই মহৎ গুণে। জাতির প্রতিটি মানুষ যদি অধ্যবসায়ী হয়ে ওঠে তাহলে সে জাতি অবশ্যই সুনাম ও গৌরবের অধিকারী হয়ে উঠবে।

যে জাতি যত বেশি অধ্যবসায়ী, সে জাতি তত বেশি উন্নত। রাষ্ট্রীয় জীবনে গৌরব ও সাফল্য আনয়নের জন্য রাষ্ট্রের সকল নাগরিককে অধ্যবসায়ী হতে হয়। যেসব রাষ্ট্রনায়ক, ধর্মসংস্কারক, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, সমাজ-সংস্কারক জীবনে সাফল্য লাভ করেছেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন অধ্যবসায়ী।

শুধু নিজের জীবনে সাফল্য লাভ করলেই চলবে না। ব্যক্তিগত জীবনের সীমানা অতিক্রম করে জাতীয় জীবনকে মহিমান্বিত করে তোলার জন্যও অনবরত সাধনা করে যেতে হবে। তাই সমাজ তথা রাষ্ট্রীয় জীবনকে বিশ্বসভায় গৌরবজনক আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে আমাদের সকলকেই অধ্যবসায়ী হতে হবে। সুতরাং ব্যক্তিজীবনে, সমাজজীবনে ও রাষ্ট্রীয় জীবনে অধ্যবসায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

দলীয় কাজঃ ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে অধ্যবসায়ের প্রভাব চিহ্নিত করো।

নতুন শব্দঃ অবিচ্ছেদ্য, উৎকর্ষ, চিরায়ত, পরাধীনতা, ধর্মসংস্কারক, মহিমান্বিত।

২০২৬

নমুনা প্রশ্ন :

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. প্রাচীন চন্দ্রবংশীয় রাজার নাম কী?

ক. কার্তবীর্জার্জুন খ. পুলস্ত্য

গ. ধৃতরাষ্ট্র ঘ. দ্রোণচার্য

২. জন্মস্থানের মাটি, জলকে ভালোবাসার মাধ্যমে–

i. মা ও মাটিকে সম্মান করা হয়

ii. কঠোর সাধনার মধ্য দিয়ে কাজে সফল হওয়া যায়

iii. নিজ জাতির মঙ্গলের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করা হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

ঘ. ii ও iii ঘ. i,ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

সুখেন সরকারি স্কুলে অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। তার বন্ধুদের কেউ কেউ স্কুলে এসে এটা ওটা ভেঙে ফেলে, বেঞ্চ নষ্ট করে, দেয়ালে দাগ দেয়, অকারণে ফ্যান, লাইট চালিয়ে চলে যায় কিন্তু সে কখনোই এগুলো করে না বরং সকলকে এটা করতে নিষেধ করে।

তাঁর ছোট ভাই রবিন বন্যার জল যাতে গ্রামে ঢুকে গ্রামকে প্লাবিত করতে না পারে সে জন্য বন্ধুদের সাথে নিয়ে বাঁধ দেওয়ার উদ্যোগ নেয়। কিন্তু কয়েকবার জলের তোড়ে বাঁধ ভেঙে গেলে বন্ধুরা হতাশ হয়ে চলে যেতে চায় । সে আবারও চেষ্টা করে এবং বাঁধ তৈরি করে।

৪. সুখেনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে কোন নৈতিক গুণটি ফুটে উঠেছে?

ক. দয়া খ. সততা

গ.দেশপ্রম ঘ. অধ্যবসায়

৫. রবিনের সাফল্যের পেছনে যে গুণটি কাজ করছে তার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে -

ক. সমাজের প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়

খ. এতে মানুষ নিজেকে নিয়ে ভাবে না

গ. স্বাধীন চিন্তা ও জাতীয়তা বোধের বিকাশ ঘটে।

ঘ. এটি গৌরব ও সাফল্য আনায়নের চাবিকাঠি

সৃজনশীল প্রশ্ন:

সুপ্রিয়া বারবার এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েও পাস করতে না পেরে হতাশ হয়ে পড়ে। একদিন সে তার বান্ধবীর সাথে আলাপ প্রসঙ্গে তার হতাশার কথা ব্যক্ত করে। বান্ধবী তাকে পরামর্শের ছলে বলে, 'একবার না পারিলে দেখ শতবার।' কথাটি সুপ্রিয়ার মনে গভীর দাগ কাটে এবং সে সবকিছু ভুলে নতুন উদ্যমে পড়ালেখা শুরু করে । এবার সে পরীক্ষায় পাস করে। এ সফলতায় তার জীবনের মোড় ঘুরে যায়। কিন্তু সুপ্রিয়ার দাদা সুজিতবাবু ছিলেন ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। কৌশলে হানাদার বাহিনীর ঘাঁটি ধ্বংস করতে দুঃসাহসিক অপারেশন পরিচালনা করতেন।

ক. দেশপ্রেম কাকে বলে?

খ. মহামুনি পুলস্ত্য স্বর্গ থেকে নেমে এলেন কেন? ব্যাখ্যা করো।

গ. সুপ্রিয়ার জন্য বান্ধবীর পরামর্শের মাঝে কোন নৈতিক গুণের প্রতিফলন ঘটেছে তা ব্যাখ্যা করো।

ঘ. সুজিতবাবুর মাঝে যে নৈতিক গুণটি রয়েছে পাঠ্যপুস্তকের কাহিনীর আলোকে তার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ‘জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী’ কথাটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

২. যে জাতি যত বেশি অধ্যবসায়ী, সে জাতি তত উন্নত– ব্যাখ্যা করো।

৩. একলব্য কীভাবে ধনুর্বিদ্যা আয়ত্ব করেছিলেন?

সপ্তম অধ্যায়

অবতার ও আদর্শ জীবনচরিত

আমাদের সমাজে এমন কিছু মানুষ জন্মেছিলেন, সারা জীবন অন্যের উপকার করে গেছেন। নিজের কথা ভাবেননি। তাঁদের কোনো লোভ-মোহ ছিল না। পরোপকারই ছিল তাঁদের একমাত্র ভাবনা। জগতের কল্যাণ করাই ছিল তাঁদের জীবনের উদ্দেশ্য। তাঁরাই হলেন মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারী। তাঁদের জীবনীই হচ্ছে আদর্শ জীবনচরিত। তাঁদের জীবনী থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি। আমাদের জীবন সুন্দরভাবে গড়তে পারি। আমরা ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে এমন বেশ কয়েকজন মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারী সম্পর্কে জেনেছি। এ অধ্যায়ে আমরা শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, ঠাকুর নিগমানন্দ, ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, মা আনন্দময়ী এবং শ্রীলভক্তিবেদান্তস্বামী প্রভুপাদের জীবনী সম্পর্কে জানব এবং নৈতিকতা গঠনে তাঁদের শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা -

- নৈতিকতা গঠনে শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর-পরবর্তীকালের জীবন ও শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- নৈতিকতা গঠনে শ্রীহরিচাঁদ ঠাকুরের জীবন ও শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- নৈতিকতা গঠনে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনচরিতের আলোকে তাঁর শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- নৈতিকতা গঠনে ঠাকুর নিগমানন্দের জীবন ও শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- নৈতিকতা গঠনে ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের জীবন ও শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- নৈতিকতা গঠনে মা আনন্দময়ীর জীবন ও শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- নৈতিকতা গঠনে শ্রীলভক্তিবেদান্তস্বামী প্রভুপাদের জীবন ও শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ ১, ২ ও ৩ : শ্রীকৃষ্ণ

আমরা ষষ্ঠ শ্রেণিতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও শৈশবকালের কথা জেনেছি। সপ্তম শ্রেণিতে জেনেছি তাঁর বাল্য ও কৈশোরের কথা। এখন আমরা জানব তাঁর কৈশোর-পরবর্তী থেকে শুরু করে শেষ জীবন পর্যন্ত কর্মকাণ্ডের কথা। আমরা আগেই জেনেছি যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান। পৃথিবীতে যখন ধর্মের গ্লানি দেখা দেয়, অধর্মের বৃদ্ধি ঘটে, তখন ধর্ম সংস্থাপনের জন্য এবং দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য তিনি জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে এবং বাল্য ও কৈশোরে কীভাবে তিনি দুষ্টদের দমন করেছেন এবং শিষ্টদের পালন করেছেন তা আমরা জেনেছি। এখন আমরা তাঁর কৈশোর থেকে পরবর্তী জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি এবং তার শিক্ষা সম্পর্কে অবগত হব।

কংসবধ

কংস ছিলেন মথুরার রাজা। তিনি ছিলেন ভীষণ অত্যাচারী। নিজের পিতা উগ্রসেনকে বন্দি করে তিনি রাজ্য দখল করেন। কৃষ্ণ তাকে হত্যা করবে–এই দৈববাণী শুনে শিশুকাল থেকেই তিনি কৃষ্ণকে মারার বহু চেষ্টা করেছেন। কিন্তু পারেননি। তাই বলে তিনি বসে ছিলেন না। একবার কৌশলে তাঁকে মারার পরিকল্পনা করলেন। মল্লযুদ্ধে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য তিনি অক্রুরকে পাঠালেন কৃষ্ণের কাছে। কৃষ্ণ-বলরাম তখন বৃন্দাবনে। অক্রুর গিয়ে কংসের দুরভিসন্ধির কথা বলে দিলেন। কৃষ্ণ ও বলরাম মথুরায় এলেন। তাঁদের হাতে অনেক যোদ্ধা মারা গেল। তা দেখে কংস ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন। তিনি কৃষ্ণকে হত্যার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে আসামাত্রই কৃষ্ণ লাফ দিয়ে তাঁর রথে উঠলেন। চুল ধরে মাটিতে ফেলে কংসকে হত্যা করেন। তারপর উগ্রসেন, দেবকী, বসুদেবসহ সকল বন্দীকে মুক্ত করেন। উগ্রসেনকে মথুরার রাজা করেন। মা-বাবার সঙ্গে কৃষ্ণ, বলরামও মথুরায় থেকে যান। মথুরায় শান্তি ফিরে আসে।

জরাসন্ধ বধ

জরাসন্ধ ছিলেন মগধের রাজা এবং কংসের শ্বশুর। তিনিও ভীষণ অত্যাচারী ছিলেন। কংসের মৃত্যুর খবর শুনে তিনি ভীষণ রেগে যান। বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে তিনি মথুরা আক্রমণ করেন। কিন্তু কৃষ্ণের হাতে তাঁর পরাজয় ঘটে। কৃষ্ণ তাঁকে ক্ষমা করে দেন। এতে জরাসন্ধ লজ্জিত হন বটে, কিন্তু তাঁর প্রতিশোধস্পৃহা বেড়ে যায়। তাই কৃষ্ণকে হত্যার জন্য তিনি পরপর সাতবার মথুরা আক্রমণ করেন। কৃষ্ণ তারপরও তাঁকে মারেননি। কিন্তু জরাসন্ধ এক বিরাট অন্যায় কাজ করতে যাচ্ছিলেন। রুদ্রদেবের পূজার জন্য তিনি একশ নরবলি দেবেন বলে স্থির করেছিলেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি ৮৬ জন রাজাকে বন্দি করে রেখেছিলেন। আর ১৪ জন হলেই তিনি তাঁর অভীষ্ট কাজ সম্পন্ন করবেন– এ খবর কৃষ্ণ জানতে পেরে দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমের সাহায্যে তাঁকে বধ করেন। ফলে একশজন রাজার প্রাণ বেঁচে যায়।

শিশুপাল বধ

শিশুপাল ছিলেন চেদিরাজ্যের রাজা। কৃষ্ণের আত্মীয়। পিসতো ভাই। কিন্তু ভীষণ অত্যাচারী। তাই শিশুপালের মা কৃষ্ণকে অনুরোধ করে বলেছিলেন ‘বাবা, তুমি ওর একশটি অপরাধ ক্ষমা করো।’ কৃষ্ণ তা করেছিলেন। গুরুজনের কথা রেখেছিলেন। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে কৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নির্বাচিত হওয়ায় ঈর্ষান্বিত শিশুপাল তাঁর নিন্দা শুরু করেন। পাণ্ডবদেরও গালমন্দ করেন। যুদ্ধের হুমকি দেন। কৃষ্ণ তখন তাঁর সুদর্শন চক্র দ্বারা তাঁকে হত্যা করেন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ও ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা

ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু দুই ভাই। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ। তাই ছোট ভাই পাণ্ডু হস্তিনাপুরের রাজা হন। পাণ্ডুর পাঁচ ছেলে। যুধিষ্ঠির বড়। তাঁদের বলা হয় পাণ্ডব। ধৃতরাষ্ট্রের একশ ছেলে। বড় দুর্যোধন। তাঁদের বলা হয় কৌরব। কৌরবরা ছিলেন অসৎ এবং দুরাচার। আর পাণ্ডবরা ছিলেন সৎ ও সদাচারী।

পাণ্ডুর মৃত্যুর পর যুধিষ্ঠিরের রাজা হওয়ার কথা। কিন্তু দুর্যোধন তা মানলেন না। তাই ধৃতরাষ্ট্র দুই পক্ষের মধ্যে রাজ্য ভাগ করে দিলেন। পাণ্ডবদের রাজধানী হলো ইন্দ্রপ্রস্থ। কিন্তু দুর্যোধন তাতে খুশি নন। তাঁর পুরো রাজ্যটাই চাই। তাই তিনি একদিন যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলায় আহ্বান করেন। মনে তাঁর দুরভিসন্ধি। কপট পাশা খেলায় যুধিষ্ঠির হেরে যান। খেলার শর্ত অনুযায়ী পাণ্ডবরা তেরো বছরের জন্য

বনে যান। বনবাস শেষে ফিরে এসে রাজ্য দাবি করেন। কিন্তু দুর্যোধন বললেন, বিনা যুদ্ধে তিনি রাজ্য দেবেন না। কৃষ্ণ তখন যুদ্ধ ঠেকানোর জন্য দুর্যোধনের কাছে যান। অনেক আলোচনা করেন।

২০২৬

কিন্তু দুর্যোধন কোনো কথাই শুনলেন না। অগত্যা কুরুক্ষেত্র নামক স্থানে দুই পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। কৃষ্ণ পাণ্ডবদের পক্ষে ছিলেন। যুদ্ধে লক্ষ-লক্ষ লোক নিহত হয়। কৌরবদের সবাই নিহত হন। যুদ্ধশেষে যুধিষ্ঠির রাজা হন এবং রাজ্যে শান্তি ফিরে আসে।

অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দুই পক্ষ মুখোমুখি। কৃষ্ণ অর্জুনের রথের সারথি। তখনো যুদ্ধ শুরু হয়নি। অর্জুন বিপক্ষে আত্মীয়-স্বজনকে দেখে কৃষ্ণকে বললেন যুদ্ধ করবেন না। আত্মীয়দের হত্যা করে তিনি রাজ্য চান না। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বললেন, 'তুমি ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম যুদ্ধ করা। তা না হলে তার অধর্ম হয়। অপযশ হয়। তাছাড়া আত্মার মৃত্যু নেই। দেহান্তর ঘটে মাত্র। তুমি যাদের দেখে মায়া করছ, তারা নিজেদের দোষে মৃত্যুকে বরণ করে আছে। তুমি উপলক্ষ মাত্র। কাজেই যুদ্ধ করে তুমি তোমার কর্তব্য পালন করো। যার যা কর্তব্য তা পালন করাই ধর্ম।'

কৃষ্ণ একথা বলার পর অর্জুনের মোহভঙ্গ হয় এবং তিনি যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে অন্যায়ের পরাজয় ঘটে, ন্যায়ের জয় হয়। এভাবে শ্রীকৃষ্ণ বারবার দুষ্টকে দমন করে শিষ্টের পালন করেছেন এবং সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছেন।

দলীয় কাজঃ দুষ্টের দমনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবদান লিখে একটি তালিকা তৈরি করো।

শ্রীকৃষ্ণের বন্ধুবাৎসল্য

শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন খুবই বন্ধুবৎসল। সুদামা নামে তাঁর এক সহপাঠী ছিলেন। একই গুরুর নিকট তাঁরা পড়াশোনা করেছেন। সুদামা খুবই গরিব। তবে ব্রহ্মবিদ। তাঁর কোনো লোভ-লালসা নেই। অন্যদিকে শ্রীকৃষ্ণ এখন দ্বারকার রাজা। তদুপরি স্বয়ং ভগবান হিসেবে তাঁর খ্যাতি সর্বত্র।

একদিন সুদামার স্ত্রী তাঁকে বললেন, 'তোমার বন্ধু কৃষ্ণ দ্বারকার রাজা। তাঁর কাছে গেলে হয়তো কিছু অর্থ পাওয়া যেত। তাতে আমাদের অভাব অনেকটা ঘুচত।' সুদামা অর্থের লোভে নয়, অনেক দিন পরে বন্ধুর সঙ্গে দেখা হবে এই ভেবে যেতে রাজি হলেন। তিনি একদিন সত্যি-সত্যিই দ্বারকায় রওনা হলেন। যাওয়ার সময় তাঁর স্ত্রী কৃষ্ণকে উপহার দেওয়ার জন্য কিছু চিড়ার খুদ সুদামার উত্তরীয় বস্ত্রে বেঁধে দিলেন।

সুদামা দ্বারকায় পৌঁছলেন। তাঁকে দেখামাত্র কৃষ্ণ দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরলেন। কৃষ্ণের স্ত্রী রুক্মিণী তাঁকে বিশেষভাবে আদর-আপ্যায়ন করলেন। কিছুক্ষণ পর শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'বন্ধু, আমার জন্য কী এনেছ?' সুদামা তখন সেই চিড়ার খুদ বের করে দিলেন। কৃষ্ণ পরম তৃপ্তিভরে তা খেলেন। তারপর তাঁরা অনেকক্ষণ গল্প করলেন। কিন্তু সুদামা একবারও অর্থের কথা বললেন না। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বন্ধুর বেশভূষা দেখে সবই বুঝতে পারলেন। তাই তিনি ঐশীবলে সুদামার বাড়ির অবস্থা পরিবর্তন করে দিলেন। সুদামা ফিরে গিয়ে দেখেন তাঁর কুঁড়েঘরের জায়গায় বিশাল অট্টালিকা। ঘরে ধন-সম্পদের অভাব নেই। কিন্তু তিনি আগের মতোই সাধারণ জীবন যাপন করতেন এবং ব্রহ্মের উপাসনা করতেন।

একক কাজঃ তোমার জানা বন্ধুপ্রীতির কোনো ঘটনা সম্পর্কে লেখো।

শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান

ভগবান যে উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ অবতাররূপে জন্ম নিয়েছিলেন, তা সম্পন্ন হয়েছে। দুষ্টদের দমন করা হয়েছে। সমাজে ধর্ম ও শান্তি পুনঃস্থাপিত হয়েছে। তাই এবার তাঁর বৈকুণ্ঠে যাবার পালা। বলরাম ইতোমধ্যে ধ্যানযোগে দেহত্যাগ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ তাই বনে প্রবেশ করে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের নিচে বসে আছেন। দূর থেকে জরা নামে এক ব্যাধ তাঁকে হরিণ মনে করে শর নিক্ষেপ করে। শরটি কৃষ্ণের পায়ে লাগে। এই শরাঘাতেই শ্রীকৃষ্ণ ইহলীলা সংবরণ করেন।

শ্রীকৃষ্ণের জীবনী থেকে আমরা এই নৈতিক শিক্ষা পাই যে, অন্যায় ও অসত্য এক সময় পরাজিত হয়ই। সমাজে দুষ্টদের ঠাঁই নেই। ভগবানও তাদের ক্ষমা করেন না। ভগবান ধনী-গরিব সকলকেই ভালোবাসেন। যার যা কর্তব্য তা পালন করা ধর্মের অঙ্গ। অতএব, আমরা এই শিক্ষাগুলো আমাদের জীবনে কাজে লাগাব।

নতুন শব্দ: গ্লানি, অক্রুর, স্পৃহা, অভীষ্ট, রাজসূয়, ইন্দ্রপ্রস্থ, ঐশীবল, অন্তর্ধান।

পাঠ ৪ ও ৫ : শ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর

গোপালগঞ্জ জেলার কাশীয়ানি উপজেলার অন্তর্গত সাফলিডাঙ্গা একটি গ্রাম। এই গ্রামেই জন্মগ্রহণ করেন হরিচাঁদ ঠাকুর। তাঁর জন্ম বাংলা ১২১৮ সলের ২৯শে (১১ই মার্চ ১৮১২ খ্রি.) ফাল্গুন। সেদিন ছিল কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী তিথি।

হরিচাঁদ ঠাকুরের পিতার নাম যশোমন্ত বৈরাগী এবং মাতা অন্নপূর্ণা দেবী। যশোমন্ত ছিলেন নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব। হরিচাঁদ ছিলেন যশোমন্তের দ্বিতীয় পুত্র। তাঁর অপর চার পুত্রের নাম যথাক্রমে কৃষ্ণদাস, বৈষ্ণব দাস, গৌরী দাস ও স্বরূপ দাস। তাঁরা সকলেই ছিলেন বৈষ্ণব।

হরিচাঁদ ছিলেন খুবই মেধাবী। কিন্তু বিদ্যালয়ের ধরাবাঁধা পাঠ তাঁর ভালো লাগেনি। তাই মাত্র কয়েক মাস গিয়ে তিনি বিদ্যালয় ত্যাগ করেন। মিশে যান রাখাল বন্ধুদের সঙ্গে। তাদের সঙ্গে গোচারণ করেন। খেলাধুলা করেন। কখনো বা গান করেন। তাঁর গানের গলা ছিল খুবই মধুর। তাই তাঁর গান, ভজন, কীর্তন শুনে সবাই মুগ্ধ হয়ে যেত। তাঁর চেহারাও ছিল খুবই সুন্দর। ব্যবহার ছিল অমায়িক। এসব কারণে সবাই তাঁকে পছন্দ করত। রাখাল বন্ধুরা তাঁকে বলত 'রাখাল রাজা'।

২০২৬

হরিচাঁদ ঠাকুর ছোটবেলা থেকেই ছিলেন ভাবুক প্রকৃতির। বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে এ বিষয়টি তাঁর মধ্যে আর প্রকট হয়। তিনি ক্রমশ ধর্মের দিকে চলে যান। তবে তিনি নতুন কোনো ধর্মমত প্রচার করেননি । তিনি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের হরিনাম প্রচার করেছেন। তিনি বলেছেন, **'ভক্তির সঙ্গে হরির নাম নিলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে।'** এই নাম সংকীর্তনই হচ্ছে তাঁর সাধন-ভজনের পথ। তিনি এই হরিনামে মাতোয়ারা হয়ে যেতেন। এজন্য তাঁর এই সাধনপথের নাম হয় 'মতুয়া'। আর তাঁর অনুসারীদের বলা হয় 'মতুয়া সম্প্রদায়'।

মতুয়াবাদের মূল কথা হলো মনুষ্যত্ব অর্জন, আত্মোন্নতি এবং সার্বিক কল্যাণ সাধন। সত্য, প্রেম ও পবিত্রতা— এই তিনটি স্তম্ভের ওপর মতুয়াবাদ প্রতিষ্ঠিত। সাধনার লক্ষ্য সত্যদর্শন বা ঈশ্বরলাভ। এজন্য চাই প্রেম। প্রেমের পূর্বশর্ত হচ্ছে পবিত্রতা। পবিত্র দেহ-মনে প্রেমের উদয় হয়। তখন ভক্তের অন্তরে প্রেমময় হরি জাগ্রত হন।

হরিচাঁদ ঠাকুর হরিনামের মাধ্যমে সামাজিকভাবে অবহেলিত সম্প্রদায়কে একতাবদ্ধ করেন। তাঁর পুত্র শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুর বলতেন, **'দল নাই যার, বল নাই তার।'** এর ফলে মতুয়াবাদ এক বিরাট আন্দোলনে পরিণত হয় এবং মতুয়া সম্প্রদায় ছড়িয়ে পড়ে বাংলার সর্বত্র।

ঠাকুর বলতেন, 'ধর্মচর্চার জন্য সংসার ত্যাগ করতে হয় না। সংসারে থেকে সংসারের কাজ করেও ধর্মচর্চা করা যায়।' তাঁর নির্দেশই ছিল, **'হাতে কাম, মুখে নাম।'** তিনি নিজেও সংসারী ছিলেন। তাঁর দুই পুত্র ও তিন কন্যা ছিলেন। পুত্ররা হলেন গুরুচরণ ও উমাচরণ। ঠাকুরের অন্তর্ধানের পর গুরুচরণই গুরুচাঁদ নামে মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রধানরূপে পূজিত হন। মতুয়া সম্প্রদায় হরিচাঁদ ঠাকুরকে বিষ্ণুর অবতার হিসেবে জ্ঞান করেন। তাই তাঁরা বলেন:

রাম হরি কৃষ্ণ হরি হরি গোরাচাঁদ।
সর্ব হরি মিলে এই পূর্ণ হরিচাঁদ॥

ঠাকুরের মতুয়াবাদে নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র, ধর্ম-বর্ণ এসবে কোনো ভেদ নেই। যেকেউ হরিনাম সংকীর্তনে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

মতুয়া সম্প্রদায়ের মূল কেন্দ্র গোপালগঞ্জের ওড়াকান্দিতে। সাফলিডাঙ্গা গ্রামের পাশে। সেখানে প্রধান হরিমন্দির অবস্থিত। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে হরিমন্দির আছে। ২০১০ সলের ঢাকার রমনা কালীমন্দিরের দক্ষিণ পাশে একটি হরিমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিবছর চৈত্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে ওড়াকান্দিতে মহাবারুণি স্নান অনুষ্ঠিত হয়। তিনদিন পর্যন্ত মেলা বসে। হাজার-হাজার লোকের সমাগম ঘটে ঐ স্নান ও মেলায়। তাঁরা হরিচাঁদ ও গুরুচাঁদ ঠাকুরকে গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

২০২৪

১২৮৪ বঙ্গাব্দের (১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দ) ২৩শে ফাল্গুন ৬৬ বছর বয়সে হরিচাঁদ ঠাকুর ইহলীলা সংবরণ করেন। ঠাকুরের জীবন ও আদর্শ নিয়ে কবিয়াল তারকচন্দ্র সরকার রচনা করেছেন 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থ। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হরিমন্দিরে মতুয়াসহ ভক্তরা নিয়মিত নামকীর্তন করেন এবং হরিচাঁদ ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

ঠাকুরের কয়েকটি বাণী

১. হরি ধ্যান হরি জ্ঞান হরি নাম সার।
প্রেমেতে মাতোয়ারা মতুয়া নাম যার॥

২. জীবে দয়া নামে রুচি মানুষেতে নিষ্ঠা।
ইহা ছাড়া আর যত সব ক্রিয়া ভ্রষ্টা॥

৩. গৃহেতে থাকিয়া যার হয় ভাবোদয়।
সেই যে পরম সাধু জানিও নিশ্চয়॥

৪. গৃহকর্ম গৃহধর্ম করিবে সকল।
হাতে কাম মুখে নাম ভক্তিই প্রবল॥

৫. গার্হস্থ্য তোমার ধর্ম অতি সনাতন।
দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন॥

হরিচাঁদ ঠাকুর তাঁর অনুসারীদের বারটি উপদেশ দিয়েছেন, যেগুলো 'দ্বাদশ আজ্ঞা' নামে পরিচিত। এই আজ্ঞাগুলো সবার জন্যই পালনীয়। আজ্ঞাগুলো হলো: (১) সদা সত্য কথা বলবে; (২) পিতা-মাতাকে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করবে; (৩) নারীকে মাতৃজ্ঞান করবে; (৪) জগৎকে প্রেম করবে; (৫) সকল ধর্মে উদার থাকবে; (৬) জাতিভেদ করবে না; (৭) হরিমন্দির প্রতিষ্ঠা করবে; (৮) প্রত্যহ প্রার্থনা করবে; (৯) ঈশ্বরে আত্মদান করবে; (১০) বহিরঙ্গে সাধু সাজবে না; (১১) ষড়রিপু বশে রাখবে; (১২) হাতে কাম, মুখে নাম করবে;

দলীয় কাজ: হরিচাঁদ ঠাকুরের উপদেশগুলো লিখে একটি পোস্টার তৈরি করো।

নতুন শব্দ: আত্মোন্নতি, মতুয়া, মহাবারুণি, বহিরঙ্গ, ষড়রিপু।

পাঠ ৬, ৭ ও ৮ : স্বামী বিবেকানন্দ

মন চল নিজ নিকেতনে
সংসার বিদেশে বিদেশির বেশে
ভ্রম কেন অকারণে ।

সুললিত কণ্ঠে অসীম দরদ দিয়ে গানটি গাইলেন এক যুবক । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তন্ময় হয়ে গানটি শুনলেন কোলকাতার সিমুলিয়ায় সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়িতে বসে । তিনি জানতে চাইলেন কে এই যুবক? সুরেন্দ্রনাথ বললেন – বিশ্বনাথ দত্তের ছেলে নরেন্দ্রনাথ । এই নরেন্দ্রনাথই পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ নামে জগদ্বিখ্যাত হন । ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারি কোলকাতায় তাঁর জন্ম । পিতা বিশ্বনাথ দত্ত ছিলেন কোলকাতা হাইকোর্টের একজন নামকরা উকিল। মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী ছিলেন একজন ধর্মপরায়ণা সুগৃহিণী ।

প্রথম দেখায়ই ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভালো লাগে নরেন্দ্রনাথকে । তিনি আকুল কণ্ঠে নরেন্দ্রনাথকে বলেন, ‘একদিন এসো দক্ষিণেশ্বরে ।’

নরেন্দ্রনাথ ছোটবেলা থেকেই ছিলেন একটু অন্য রকম । নির্ভীকতা, সত্যবাদিতা, উদার দৃষ্টিভঙ্গি, জীবে দয়া— এসব ছিল তাঁর স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য । হিন্দুদের জাত-পাত ভেদ তাঁর ভালো লাগত না । তাঁর পিতার মক্কেলদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, মুসলমান, খ্রিষ্টান সবই ছিল । বাড়ির বৈঠকখানায় তাঁদের সবার জন্য আলাদা আলাদা হুঁকা ছিল তামুক সেবনের জন্য । প্রত্যেক হুঁকার গায়ে নাম লেখা ছিল । নরেন্দ্রনাথ একদিন সব হুঁকায় মুখ লাগাচ্ছিলেন । এমন সময় পিতা বিশ্বনাথ এসে পড়েন । তিনি ছেলেকে বলেন, ‘এ কী হচ্ছে, নরেন?’ নরেন্দ্রনাথ বললেন, ‘আমি সব হুঁকা টেনে দেখলাম, কৈ আমার তো জাত গেল না!’ ছেলের এই অদ্ভুত কথা শুনে পিতা হেসে ফেললেন । প্রভাত যেমন সমস্ত দিনের ইঙ্গিত দেয়, এই ঘটনাও তেমনি সেদিন ভবিষ্যতের সর্বজীবে সমদর্শী বিবেকানন্দের ইঙ্গিত দিয়েছিল ।

নরেন্দ্রনাথ ছেলেবেলা থেকেই খুব মেধাবী ছিলেন । এন্ট্রান্স পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন । ১৮৮৪ সনে তিনি বিএ পাস করেন । এর পরপরই তাঁর পিতার মৃত্যু হয় । ফলে তাঁদের পরিবার দারুণ অর্থসংকটে পড়ে । মা এবং ছোট ভাই-বোনদের ভরণ-পোষণের জন্য তিনি বিভিন্ন জায়গায় চাকরির সন্ধান করেন । কিন্তু সুবিধা হয় না । অবশেষে কোলকাতার অ্যাটর্নি অফিসে একটা কাজ নেন এবং বই অনুবাদ করে কিছুকিছু রোজগার করতে থাকেন ।

এ সময়ে নরেন্দ্রনাথের মনে এক পরিবর্তন দেখা দেয় । তিনি কেবল ঈশ্বর সম্পর্কে চিন্তা করেন । ঈশ্বর কি আছেন? তাঁকে কি দেখা যায়? এ ধরনের প্রশ্ন প্রায়ই তাঁর মনে জাগে । তিনি অনেককে এ প্রশ্ন জিজ্ঞেসও করেছেন । মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকেও প্রশ্নটি করেছিলেন । কিন্তু কারো উত্তরে তিনি

২০২৫

সন্তুষ্ট হতে পারেননি। এমন সময় একদিন তিনি দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে যান। সুযোগমতো তিনি রামকৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি কি ঈশ্বর দেখেছেন?' রামকৃষ্ণ হাসতে হাসতে বলেন, 'হ্যাঁ, দেখেছি, যেমন তোকে দেখছি; চাইলে তোকেও দেখাতে পারি।'

এই সহজ-সরল উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণকে নরেন্দ্রনাথের ভালো লাগে। তিনি নিয়মিত দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত শুরু করেন। একসময় শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষা নেন। নরেন্দ্রনাথ হন গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী। তখন তাঁর নাম হয় বিবেকানন্দ। পরবর্তীকালে ভক্তরা তাঁকে স্বামী বিবেকানন্দ বা শুধু স্বামীজী বলেই ডাকতেন।

বিবেকানন্দ গৃহত্যাগ করে ভারতভ্রমণে বের হন। তিনি দেখেন, সারা দেশে কেবল দারিদ্র্য আর দারিদ্র্য। কেবল অশিক্ষা আর কুশিক্ষা। দেশবাসীর এই দুরবস্থা দেখে তিনি খুব ব্যথিত হন। তাই কীভাবে এসব থেকে দেশবাসীকে উদ্ধার করা যায়, সে-কথা চিন্তা করতে লাগলেন। কন্যাকুমারীকায় ভারতের শেষ শিলাখণ্ডে বসে তিনি ধ্যানস্থ হলেন। ধ্যানের মাধ্যমে তিনি বুঝতে পারলেন, ভারতের জীবনীশক্তির উৎস হচ্ছে ধর্ম। এই ধর্ম হচ্ছে দেবতাজ্ঞানে মানুষের সেবা। এই ধর্মমন্ত্রে ভারতবাসীকে জাগিয়ে তুলতে হবে। তবেই ভারতের উন্নতি হবে।

১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি আমেরিকা যান। সেখানে ১১ই সেপ্টেম্বর শিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্ম সম্মেলনে তিনি বক্তৃতা দেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় বলেন, 'হিন্দুধর্ম পৃথিবীর সকল ধর্মকে সমান সত্য মনে করে। সব ধর্মের লক্ষ্যই এক। নদীসমূহ যেমন এক সাগরে গিয়ে মিলিত হয়, তেমনি সকল ধর্মেরই লক্ষ্য এক—ঈশ্বরলাভ। তাই বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি।' ধর্মসভার বিচারে তিনি হন শ্রেষ্ঠ বক্তা। তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে আমেরিকার বিখ্যাত হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন হেনরি রাইট বলেছিলেন, 'ইনি এমন একজন মানুষ, যাঁর পাণ্ডিত্য আমাদের সমস্ত অধ্যাপকদের মিলিত পাণ্ডিত্যকেও হার মানায়।'

ধর্মসভায় বক্তৃতার পর সারা আমেরিকায় বিবেকানন্দের নাম ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন জায়গা থেকে আমন্ত্রণ আসে বক্তৃতার জন্য। তিনিও হিন্দু ধর্ম-দর্শন, বিশেষত বেদান্ত দর্শন সম্পর্কে একের পর এক বক্তৃতা দিয়ে আমেরিকা জয় করেন। তারপর যান ইউরোপে। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ইতালি প্রভৃতি দেশ ঘুরে বেড়ান

এবং বক্তৃতা দেন। তিনি বেদান্ত দর্শনের মূল তত্ত্ব তুলে ধরেন। তিনি বক্তৃতার মাধ্যমে এই সত্য প্রতিষ্ঠা করেন যে, হিন্দুধর্ম কেবল মূর্তিপূজা করে না, সকল দেবতার পূজার মধ্য দিয়ে এক ঈশ্বরেরই আরাধনা করে। অর্থাৎ হিন্দুধর্ম একেশ্বরবাদী। তাঁর বক্তৃতা থেকে ইউরোপের মানুষ হিন্দু ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে নতুন করে জানতে পারেন। অনেকে তাঁর পরম ভক্ত হয়ে যান। তাঁদের মধ্যে মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেলের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বিবেকানন্দের আদর্শে এতটাই উদ্বুদ্ধ হন যে, নিজের জন্মভূমি আয়ারল্যান্ড ছেড়ে ভারতবর্ষে চলে আসেন। বিবেকানন্দের কাছে তিনি দীক্ষা নেন। তখন তাঁর নাম হয় ভগিনী নিবেদিতা।

প্রায় চার বছর পর বিবেকানন্দ ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে দেশে ফিরে আসেন। দেশের মানুষ তাঁকে বিশাল সংবর্ধনা দেয়। তার জবাবে তিনি দেশের মানুষকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়তে বলেন। সমস্ত কুসংস্কার পরিত্যাগ করতে বলেন। সবাইকে বিভেদ ভুলে এক হতে বলেন। তিনি বলেন, 'শক্তি ও সাহসিকতাই ধর্ম। দুর্বলতা ও কাপুরুষতাই পাপ। স্বাধীনতাই ধর্ম, পরাধীনতাই পাপ। পরোপকারই ধর্ম, পরপীড়নই পাপ। সত্যই সকল ধর্মের ভিত্তি। সৎ হওয়া আর সৎ কর্ম করা ধর্মের অঙ্গ।'

বিবেকানন্দ বলতেন–নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর সকলেই আমাদের ভাই। এদের সেবাই পরম ধর্ম। তিনি দরিদ্রদের উন্নয়নের জন্য সর্বদা চিন্তা করতেন। তাদের দারিদ্র্য দূর করা এবং তাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের কথা ভাবতেন। তাঁর গুরুদেব বলতেন **'খালি পেটে ধর্ম হয় না'**। তাই তিনি সবার আগে মানুষের দারিদ্র্য ঘোচানোর কথা ভাবতেন। তিনি বলেছেন, 'দরিদ্রদের মুখে অন্ন জোগাতে হবে, শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। আগে অন্ন, তারপর ধর্ম।'

বিবেকানন্দের মহান বাণী হলো 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা।' ঈশ্বরসেবার আগে তাঁর সৃষ্ট জীবের সেবা করতে হবে। জীবসেবা করলেই ঈশ্বরসেবা হবে। জীবকে জীবজ্ঞানে সেবা করলে তা হবে দয়া, আর আত্মজ্ঞানে সেবা করলে হবে প্রেম। তাই তিনি বলেছেন:

বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর॥

তাঁর এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে গ্রামে-গ্রামে, নগরে-নগরে স্থাপিত হয়েছে শত-শত সেবাশ্রম, সেবাকেন্দ্র ও বৃদ্ধাশ্রম। এসবের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে সেবা ও শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে।

বিবেকানন্দ জীবসেবার কথা শুধু মুখেই বলতেন না, স্বয়ং কাজেও করে দেখিয়েছেন। ১৮৯৮ সনে কোলকাতায় একবার মহামারি আকারে প্লেগ দেখা দেয়। তখন তিনি দার্জিলিঙে ছিলেন। প্লেগের কথা শুনে সঙ্গেসঙ্গে তিনি কোলকাতায় চলে আসেন এবং গুরুভাইদের নিয়ে রোগীদের সেবায় লেগে যান।

বিবেকানন্দ নারীদের উন্নয়নের ব্যাপারে খুবই সোচ্চার ছিলেন। তিনি বলেছেন, 'মেয়েদের প্রত্যেকেই এমন কিছু শিখুক যাতে প্রয়োজন হলে তাদের জীবিকা তারা অর্জন করতে পারে। শিল্প-ব্যবসা-কৃষি

শেখার ক্ষেত্রে পুরুষের সমান অধিকার ও সুযোগ মেয়েদের থাকতে হবে।’ তিনি নারীকে শক্তির প্রতীক হিসেবে দেখতেন। তাই তিনি বলতেন শক্তিকে বাদ দিয়ে বিশ্বের পুনর্জাগরণ সম্ভব নয়। তাঁর মতে প্রত্যেক পুরুষের কাছে স্ত্রী ছাড়া অন্য সব নারীরই মায়ের মতো হওয়া উচিত। তিনি বিধবাদের পুনর্বিবাহের পাশাপাশি শিক্ষা গ্রহণ করে স্বাবলম্বী হয়ে আত্মসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকারও পরামর্শ দিয়েছেন। আমেরিকায় হিন্দু-বিধবাদের অবস্থা সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়ে যে অর্থ উপার্জন করেছিলেন, তার একাংশ তিনি বরানগরে হিন্দুবিধবাশ্রমে প্রদান করেন। এই আশ্রমে বিধবাদের জীবনধারণের উপযোগী শিক্ষা দেওয়া হতো। তিনি নারীদের সন্ন্যাস গ্রহণেরও পক্ষপাতী ছিলেন।

বিবেকানন্দ তৎকালীন হিন্দুসমাজের ঘৃণ্য প্রথা অস্পৃশ্যতার প্রচণ্ড বিরোধী ছিলেন। তিনি সকলকে অমৃতের সন্তান বলে মনে করতেন। তাঁর এই মনোভাব দ্বারা মহাত্মা গান্ধীও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তৎকালীন অনেক বিশিষ্ট লেখকও প্রভাবিত হয়েছিলেন।

বিবেকানন্দ তাঁর গুরুদেব রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আদর্শ প্রচারের জন্য কলকাতার বরানগরে ‘রামকৃষ্ণ মঠ’ স্থাপন করেন। পরে স্থাপন করেন ‘রামকৃষ্ণ মিশন’। ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার বেলুড়ে গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে স্থাপন করেন মঠের স্থায়ী কেন্দ্র। সাধারণভাবে এটি ‘বেলুড় মঠ’ নামে পরিচিত। বর্তমানে এটিই রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রধান কেন্দ্র।

বিবেকানন্দের কয়েকটি বাণী

১. আমার ঈশ্বর কোনো দূর গ্রহ-উপগ্রহের অধিবাসী নয়, অজ্ঞতাবশত যাকে আমরা মানুষ বলি সে-ই আমার ঈশ্বর।

২. পরধর্ম বা পরমতের প্রতি শুধু দ্বেষভাবশূন্য হলেই চলবে না, আমাদের ঐ ধর্ম বা মতকে আলিঙ্গনও করতে হবে; সত্যই সকল ধর্মের ভিত্তি।

৩. সৎ হওয়া এবং সৎ কাজ করা – তার মধ্যেই সমস্ত ধর্ম। যে ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে সে-ই ঠিক ঠিক ধার্মিক।

৪. মানুষের মহত্ত্বের পরিচয় তার চরিত্রে, বৃত্তিতে নয়।

৫. পরোপকারই ধর্ম, পরপীড়নই পাপ। শক্তি ও সাহসিকতাই ধর্ম, দুর্বলতা ও কাপুরুষতাই পাপ। স্বাধীনতাই ধর্ম, পরাধীনতাই পাপ। অপরকে ভালোবাসাই ধর্ম, অপরকে ঘৃণা করাই পাপ। ঈশ্বর ও নিজ আত্মাতে বিশ্বাসই ধর্ম, সন্দেহই পাপ। অভেদ দর্শনই ধর্ম, ভেদ দর্শনই পাপ।

৬. ভুলো না – নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই।

৭. দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞান, কাতর – এরাই তোমার দেবতা হোক, এদের সেবাই পরম ধর্ম বলে জানবে। দরিদ্র দেবো ভব। মূর্খ দেবো ভব।

একক কাজ: তোমার জানা জীবসেবামূলক একটি বাস্তব ঘটনা সম্পর্কে লেখো।

নতুন শব্দ: অস্পৃশ্যতা, মূর্তি পূজা, গোত্র সম্মান, অনুপ্রাণিত।

পাঠ ৯, ১০ ও ১১ : ঠাকুর নিগমানন্দ

মেহেরপুর জেলার অন্তর্গত কুতুবপুর একটি গ্রাম। সেই গ্রামে বাস করতেন ভুবনমোহন ভট্টাচার্য নামে একজন সদাচারী ব্রাহ্মণ। তাঁর স্ত্রীর নাম মাণিক সুন্দরী। উভয়ই নিয়মিত পূজা-পার্বণ ও ব্রতাচার নিয়ে থাকতেন।

মাণিক সুন্দরীর পিত্রালয় মেহেরপুরেরই অন্তর্গত রাধাকান্তপুর গ্রামে। এই গ্রামেই ১২৮৭ বঙ্গাব্দের (১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দ) ঝুলন পূর্ণিমার রাতে মাতুলালয়ে ঠাকুর নিগমানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর চোখ দুটি ছিল পদ্ম বা নলিনীর মতো দেখতে। তাই তাঁর নাম রাখা হয় নলিনীকান্ত। নলিনীকান্ত ভট্টাচার্য।

নলিনীর বয়স তখন সাত বছর। পিতা ভুবনমোহন ছেলেকে ভর্তি করিয়ে দেন গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। খেলাধুলা ও দুরন্তপনার পাশাপাশি নলিনী পড়াশোনায়ও মেধার পরিচয় দিয়ে আসছিলেন শুরু থেকেই। তাই প্রাথমিকের পাঠ তিনি সাফল্যের সঙ্গেই শেষ করেন। এরপর তিনি ভর্তি হন দারিয়াপুর গ্রামের মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ে। থাকতেন রাধাকান্তপুরে মাতুলালয়ে।

একাদশ বছর বয়সে নলিনীর উপনয়ন হয়। তখন থেকেই তাঁর মধ্যে ধর্মভাব জেগে ওঠে। তিনি ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতেন। নিয়মিত রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি পাঠ করতেন। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। তিনি জাতিভেদ মানেন না। ব্রাহ্মণের মিথ্যা অহংকারকে ঘৃণা করেন। তবে প্রকৃত সম্মানিত ব্যক্তিকে সম্মান করেন। যুক্তি দিয়ে তিনি নিজের মতকে সমর্থন করেন। কিন্তু নিজের মত ঠিক নয় বুঝতে পারলে তিনি নির্দ্বিধায় পরাজয় স্বীকার করেন। ধর্মের নামে ভণ্ডামিকে তিনি তীব্রভাবে ঘৃণা করেন।

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সম্পর্কে নলিনীর দাদামশাই। তিনি নলিনীকে খুব স্নেহ করতেন। নলিনীও তাঁকে খুব ভালোবাসতেন এবং শ্রদ্ধা করতেন। দুজনের মধ্যে অনেক বিষয়ে কথা হতো। এর মধ্য দিয়ে নলিনী বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট থেকে অনেক কিছু শিখেছিলেন। নলিনীর ইংরেজি পরীক্ষার আগেই বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু হয়। কিছুদিন পর মা মাণিক সুন্দরীও পরলোক গমন করেন। এ-দুটি ঘটনা নলিনীর মনে গভীর রেখাপাত করে। মানব জীবনের নশ্বরতা তাঁকে ভীষণভাবে ভাবিয়ে তোলে।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর নলিনীর মধ্যে বিরাট পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। দেব-দ্বিজে, ধর্মে-কর্মে, শাস্ত্রাদিতে তাঁর বিশ্বাস উঠে যায়। ভগবানে বিশ্বাস নেই। ঝোঁক দেখা দেয় যাত্রা-থিয়েটার আর সাহিত্যচর্চায়। পাশাপাশি চলে জনসেবার কাজ। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের বাড়ি গিয়ে রোগীর সেবা করেন। কোনো বাড়িতে মৃতদেহ সৎকারে লোক পাওয়া না গেলে নলিনী সেখানে সাগ্রহে

এগিয়ে যান। এ নিয়ে পাড়া-প্রতিবেশীদের কাছ থেকে পিতা ভুবনমোহনকে অনেক নিন্দাবাক্য শুনতে হয়।

নলিনীর এই আচরণ দেখে ভুবনমোহন খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন। পুত্রকে সংসারে আবদ্ধ করার জন্য তিনি তাঁর বিবাহ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। যথাসময়ে নলিনীর বিয়ে হয়ে যায়। কন্যা হালিশহরের বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের মেয়ে সুধাংশুবালা। নলিনীর বয়স তখন ১৭ এবং সুধাংশুবালার ১২।

বিয়ের কিছুদিন পর নলিনীকান্ত সিদ্ধান্ত নিলেন উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করবেন। তাই পিতার অনুমতি নিয়ে তিনি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন। এখানে কিছুদিন পড়ার পর তিনি ঢাকার সার্ভে স্কুলে ভর্তি হন। কারণ, এখান থেকে পাস করলে সহজেই চাকরি পাওয়া যায়। এখান থেকে পাস করার পর তিনি স্বগ্রামে ফিরে যান এবং কুতুবপুর স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। কিছুদিন পর ওভারসিয়ারের চাকরি নিয়ে দিনাজপুর সরকারি অফিসে যোগদান করেন। কিন্তু এ চাকরিতে মিথ্যাচার করতে হয় বলে তিনি চাকরি পরিবর্তন করেন। এরপর আরেক দফা চাকরি পরিবর্তন করে তিনি কলকাতার জনৈক জমিদারের এস্টেটে চাকরি নেন। সেই উপলক্ষ্যে তিনি তখন কলকাতায় ছিলেন। স্ত্রী সুধাংশুবালা তখন অন্তঃসত্ত্বা। তাই তাঁকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন। সেখানে তাঁর একটি কন্যাসন্তান জন্মে। কয়েকদিন পর কন্যাসন্তানটি মারা যায়। স্ত্রীও বেশ কিছুদিন রোগ ভোগের পর মারা যান। এতে নলিনী খুব আঘাত পান। সংসারের প্রতি তাঁর মন উঠে যায়। তিনি চাকরিও ছেড়ে দেন। প্রায়ই তিনি স্ত্রী সুধাংশুবালার ছায়ামূর্তি দেখতে পান। তিনি এর রহস্য জানতে চান। পরলোক সম্পর্কে চর্চা শুরু করেন। এমনি সময় একদিন কোলকাতায় পূর্ণানন্দ পরমহংসের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। পূর্ণানন্দ বলেন, স্ত্রীমাত্রেই আদ্যাশক্তি মহামায়ার অংশ। তাঁকে পেতে হলে সাধনা করতে হবে।

এরপর নলিনী যান বীরভূমের মহাতীর্থ তারাপীঠে। সেখানে ছিলেন মহাসাধক বামাক্ষেপা। তিনি তাঁকে তারামন্ত্রে দীক্ষা দেন। আর বলেন তারামায়ের সাধনা করতে। নলিনী একমনে সাধনা করতে লাগলেন। অবশেষে মা স্ত্রীরূপে দেখা দিলেন। কিন্তু নলিনী তাঁকে ধরতে গেলেই তিনি মিলিয়ে যান। এ কথা তিনি বামাক্ষেপাকে খুলে বললেন। বললেন, 'এ দেবী কে? আমিই বা কে?' বামা বললেন, 'এ তত্ত্ব জানতে হলে তোকে জ্ঞান সাধনা করতে হবে। জ্ঞানীগুরুর সন্ধান করতে হবে।'

বামাক্ষেপার কথামতো নলিনী জ্ঞানীগুরুর সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। ঘুরতে ঘুরতে পুষ্করতীর্থে এসে জ্ঞানীগুরুর সন্ধান পান। তিনি হলেন সচ্চিদানন্দ পরমহংস। তাঁর আশ্রমে থেকে নলিনী বেদ-বেদান্ত, দর্শনশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন। গুরু তাঁকে বৈদিক সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষা দেন। তখন তাঁর নতুন নাম হয় 'স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী'। এরপর তিনি ভারতের বিভিন্ন তীর্থস্থান যেমন–কাশী, কামাখ্যা, হিমালয়, কোকিলামুখ ইত্যাদি ঘুরে বেড়ান। এসব জায়গায় তিনি যোগ সাধনা করেন।

পরে জনহিতার্থে ঠাকুর নিগমানন্দ সদ্‌ধর্ম প্রচার শুরু করেন। ভারতের বিভিন্ন স্থানে তিনি মঠ বা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে ব্রহ্মচর্য সাধনার ব্যবস্থা করেন। কারণ তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, প্রথম জীবনে ব্রহ্মচর্য পালন না করলে পরবর্তী জীবন সুন্দরভাবে গড়ে উঠতে পারবে না। পাশাপাশি তিনি আদর্শ গৃহস্থ জীবন গঠনের ওপরও জোর দেন। এছাড়া ঠাকুর কৃষিকর্ম, গো-সেবা, অনাথ আশ্রম, ঋষি বিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেও জনসেবার দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন।

ঠাকুর তাঁর আদর্শ প্রচারের জন্য 'আর্য্য-দর্পণ' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করে গেছেন, যা এখনো নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এটি সনাতন ধর্মের মুখপত্র হিসেবে পরিচিত। এছাড়া ঠাকুর 'যোগীগুরু', 'জ্ঞানীগুরু', 'তান্ত্রিক গুরু', 'প্রেমিক গুরু', 'ব্রহ্মচর্য সাধন', 'বেদান্তবিবেক', 'তত্ত্বমালা' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনার মাধ্যমেও তাঁর আদর্শ প্রচার করে গেছেন।

ঠাকুর নিগমানন্দের দর্শন ছিল – **'শঙ্করের মত ও গৌরাঙ্গের পথ',** অর্থাৎ সেবা ও ভক্তির পথে অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা। এই আদর্শ প্রচারে বাংলার চারদিকে চারটি সারস্বত আশ্রম সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশে সদ্‌ধর্ম প্রচারের জন্য সহস্রাধিক সারস্বত সঙ্ঘ আছে।

তন্ত্র, জ্ঞান, যোগ ও প্রেম–এই চতুঃসাধনে সিদ্ধ মহাসাধক ঠাকুর নিগমানন্দ ১৩৪২ সালের (১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দ) ১৩ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার অপরাহ্ণ ১:১৫ মিনিটে ইহলোক ত্যাগ করেন।

ঠাকুরের কয়েকটি বাণী

১. আদর্শ গার্হস্থ্য জীবন প্রতিষ্ঠাই আমার উদ্দেশ্য। প্রাচীন ঋষিগণ প্রবর্তিত পথে চলে তোমরা আদর্শ গৃহস্থ হও। শুধু সন্ন্যাসী হয়ে বনে গেলেই ভগবান লাভ হয় না। গৃহে থেকে আদর্শ গৃহী হয়ে ধর্ম সাধনা করলেও ভগবান লাভ হয়।

২. আত্মজ্ঞান কিংবা নারায়ণ জ্ঞানে যথাসাধ্য জীবসেবা কর। পরের উপকার করতে কুণ্ঠিত হয়ো না। এই প্রত্যক্ষ ধর্ম ত্যাগ করলে আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ হয় না। জীবসেবাই কলির একমাত্র ধর্ম।

৩. নর-ই সাক্ষাৎ নারায়ণ। সুতরাং নরের সেবা ব্যতীত নারায়ণের কৃপা হয় না। তাই গার্হস্থ্য ধর্মের এত মাহাত্ম্য। আপন প্রাণকে বিশ্ব প্রাণের সঙ্গে মেলাতে হবে। তবেই ভগবান যেচে দয়া করবেন। নতুবা মুখের প্রার্থনায় তাঁর সিংহাসন টলে না।

৪. কেবল কতগুলো কর্মানুষ্ঠানে জীবনে পূর্ণতা লাভ হয় না। ভগবানে আত্মনির্ভর করতে অভ্যাস করো। কীট থেকে ব্রহ্ম পর্যন্ত একই ভগবানের বিকাশ জেনে সর্বভূতের হিত সাধনে জীবন উৎসর্গ করো। মানব জীবন ধন্য হবে। পবিত্র আনন্দের অধিকারী হবে।

ঠাকুর নিগমানন্দের জীবনী থেকে আমরা এই নীতিশিক্ষা পাই যে, মিথ্যা অহংকার কারো পক্ষেই ভালো নয়। জাতিভেদ সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে ভালোবাসতে হবে। আধ্যাত্মিক উন্নতির পাশাপাশি মানুষের বাস্তব জীবনেরও উন্নয়ন প্রয়োজন। আদর্শ গৃহী হয়েও ভগবানকে লাভ করা যায়। নারায়ণজ্ঞানে মানুষকে সেবা করতে হবে। জীবসেবাই কলির একমাত্র ধর্ম। সকল জীবের মধ্যেই ঈশ্বর আছেন। সকল জীবের সেবা করা মানেই ঈশ্বরেরও সেবা করা। তাই সর্ব জীবের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করতে হবে।

ঠাকুর নিগমানন্দের এই শিক্ষা আমরা সব সময় মনে রাখব এবং আমাদের জীবনে পালন করার চেষ্টা করব।

দলীয় কাজ: ঠাকুর নিগমানন্দের জনহিতকর কাজের একটি তালিকা তৈরি করো।

পাঠ ১২ ও ১৩ : ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

পাবনায় পদ্মার তীরবর্তী একটি গ্রাম হিমাইতপুর। সেই গ্রামে ১২৯৫ বঙ্গাব্দের ৩০শে ভাদ্র (১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর) অনুকূলচন্দ্রের জন্ম। পিতা শিবচন্দ্র চক্রবর্তী এবং মাতা মনোমোহিনী দেবী।

হিমাইতপুরেই অনুকূলচন্দ্রের শৈশব, বাল্য ও কৈশোর অতিক্রান্ত হয়। হিমাইতপুর পাঠশালায় তিনি লেখাপড়া শুরু করেন। সেখানকার পাঠ শেষ হলে তিনি পাবনা ইনস্টিটিউটে ভর্তি হন। এখানে নবম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ে তিনি পশ্চিমবঙ্গের নৈহাটী উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এ বিদ্যালয় থেকে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য মনোনীত হন। কিন্তু একজন সহপাঠী পরীক্ষার ফিসের টাকা জোগাড় করতে পারেননি শুনে তাঁকে তিনি নিজের টাকা দিয়ে দেন। ফলে ঐবার তাঁর পরীক্ষা দেয়া হয়নি। পরেরবার তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করেন। এরপর মায়ের ইচ্ছায় তিনি কোলকাতার ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। তখন তাঁদের সংসারে আর্থিক অনটন চলছিল। তাই অনেক কষ্ট করে তিনি পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। একদিন প্রতিবেশী এক ডাক্তার হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ওষুধসহ তাঁকে একটি বাক্স দেন। তা দিয়ে তিনি কুলি-মজুরদের সেবা শুরু করেন। সেবার আনন্দের মধ্য দিয়ে যা আয় হতো তাতেই তাঁর দিন চলে যেত।

অনুকূলচন্দ্র ডাক্তার হয়ে নিজ গ্রামে ফিরে আসেন। সেখানে তিনি চিকিৎসা কর্ম শুরু করেন। এতে তাঁর অভূতপূর্ব সাফল্য আসে। কিন্তু তিনি উপলব্ধি করলেন, মানুষের দুঃখের স্থায়ী সমাধান করতে হলে কেবল শারীরিক চিকিৎসা নয়, মানসিক ও আত্মিক চিকিৎসাও দরকার। কারণ শরীরের সঙ্গে মন ও আত্মার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। তাই তিনি মানসিক ও আত্মিক চিকিৎসাও শুরু করলেন।

অনুকূলচন্দ্র ছিলেন সমাজের অসহায়, অবহেলিতদের বন্ধু। তাদের নিয়ে তিনি কীর্তনদল গঠন করেন। কীর্তনের মধ্য দিয়ে তিনি তাদের মানসিক শান্তির বিধান করেন। অনেক শিক্ষিত তরুণও এগিয়ে আসেন। তাঁর এই কীর্তন একসময় একটি আন্দোলনে পরিণত হয়। সবাই তাঁকে তখন ডাক্তার না বলে বলত 'ঠাকুর'। সেই থেকে তিনি 'ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র' নামে পরিচিত হন। তাঁর খ্যাতি ক্রমশ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

মানুষ যাতে সৎপথে থাকে, সৎ চিন্তা করে সেজন্য ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র হিমায়েতপুরে প্রতিষ্ঠা করেন সৎসঙ্গ আশ্রম। এর মাধ্যমে তিনি তাঁর অনুসারীদের আত্মিক উন্নতির জন্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভে সহায়তা করতেন। দলেদলে লোক তাঁকে গুরু মেনে এই সঙ্গে যোগ দিতে লাগল। তিনি এই সঙ্ঘের মাধ্যমে ধর্মের সঙ্গে কর্মের সংযোগ ঘটান। শিক্ষা, কৃষি, শিল্প, সুবিবাহ—এই চারটি ছিল আশ্রমের মূল ভিত্তি। ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস—সনাতন আর্য জীবনের এই চারটি স্তরে জীবন যাপনে তিনি সকলকে অভ্যস্ত করে তোলেন। অনুকূলচন্দ্র লোকহিতার্থে প্রাচীন ঋষিদের আদর্শে তপোবন বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ, পাবলিশিং হাউজ, ছাপাখানা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেন। এর ফলে আধ্যাত্মিক জীবনের পাশাপাশি মানুষ জাগতিক জীবনেও উপকৃত হয়। মহাত্মা গান্ধী সৎসঙ্গের এই কর্মকাণ্ড দেখে অত্যন্ত মুগ্ধ হন এবং এর প্রশংসা করেন।

১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে অনুকূলচন্দ্র বিহারের দেওঘরে যান এবং সেখানে সৎসঙ্গের আদর্শে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। পরের বছর ভারত ভাগ হলে তিনি আর ফিরে আসেননি। ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারি ৮১ বছর বয়সে তিনি দেওঘরেই দেহত্যাগ করেন।

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের শিষ্যসম্প্রদায় এবং সৎসঙ্গের কর্মকাণ্ড উভয় বাংলার নানা অঞ্চলে আজও সক্রিয়। ঢাকা ও চট্টগ্রামসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এর আশ্রম ও কার্যালয় আছে। এর মাধ্যমে জনগণকে সেবা দেয়া হয়।

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র তাঁর আদর্শ ও চিন্তা-ভাবনা মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ৪৬ টি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। সে-সবের মধ্যে 'পুণ্যপুঁথি', 'অনুশ্রুতি', 'চলার সাথী' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের শিক্ষা ছিল: মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই। যে যে-সম্প্রদায়েরই হোক-না-কেন, মনে রাখতে হবে ঈশ্বর এক, ধর্মও এক। সংসারে থাকবে, মন রাখবে ভগবানে। শুধু লেখাপড়া করলেই বড় হওয়া যায় না, আচার-ব্যবহারও জানতে হয়। ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের এই শিক্ষা আমরা সব সময় স্মরণে রাখব এবং মেনে চলব।

একক কাজ: ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের শিক্ষার প্রভাব সম্পর্কে লেখো।

নতুন শব্দ: আত্মিক চিকিৎসা, লোকহিতার্থ, পুণ্যপুঁথি, অনুশ্রুতি।

২০২৬

পাঠ ১৪ ও ১৫ : মা আনন্দময়ী

মা আনন্দময়ীর জন্ম ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার খেওড়া গ্রামে। পিতা বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য, মা মোক্ষদা সুন্দরী। বিপিনবিহারীর পৈতৃক নিবাস ছিল বিদ্যাকুটে।

আনন্দময়ীর আসল নাম নির্মলা সুন্দরী। গ্রামের পাঠশালায় নির্মলার পড়াশোনা শুরু হয়। কিন্তু পড়াশোনা বেশিদূর এগোয়নি। ছোটবেলা থেকেই তাঁর মধ্যে দিব্যভাবের প্রকাশ ঘটে। হরিনাম কীর্তন হলে তিনি আকুল হয়ে শুনতেন।

১৩১৫ বঙ্গাব্দের (১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দ) ২৫শে মাঘ নির্মলার বিয়ে হয়। তখন তাঁর বয়স তের শেষ হয়ে চৌদ্দ বছরে পড়েছে। স্বামী রমণীমোহন চক্রবর্তী। বাড়ি বিক্রমপুরের আটপাড়া গ্রামে। বিয়ের পর নির্মলা স্বামীর নাম দেন ভোলানাথ।

ভোলানাথ বাজিতপুরে সেটেলমেন্ট বিভাগে চাকরি করেন। ১৩২৪ বঙ্গাব্দের (১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দ) নির্মলা স্বামীর কর্মস্থলে যান। তাঁর মধ্যে ক্রমশই দিব্যভাব প্রকটিত হতে থাকে। কোথাও কৃষ্ণনাম শুনলে কৃষ্ণপ্রেমে তিনি আকুল হয়ে যান। একবার ভূদেবচন্দ্র বসুর বাড়িতে কীর্তন হচ্ছে:

হরিহরয়ে নমঃ কৃষ্ণযাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ॥

নির্মলা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কীর্তন শুনতে শুনতে একসময় তিনি অজ্ঞান হয়ে যান। তখন তাঁর দেহ থেকে দিব্য আলো প্রকাশিত হচ্ছিল। সবাই ভয় পেয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি আবার সুস্থ হয়ে উঠলেন। এভাবে নির্মলার মধ্যে মহাভাবের শুরু। সাধারণ মানুষের অজ্ঞাতে তাঁর শরীরে চলতে থাকে সাধন-ভজনের নানারকম লীলা। দিব্য জ্যোতির আভায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তাঁর সমস্ত শরীর।

১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে ভোলানাথ চলে আসেন ঢাকার শাহবাগে। তখনকার নবাবের বাগানের তত্ত্বাবধায়কের কাজ নিয়ে। সঙ্গে নির্মলাও আসেন। এই শাহবাগে মা কালীর মন্দিরে নির্মলার মধ্যে মাতৃমূর্তি প্রকটিত হয়। তখন থেকেই তিনি 'মা আনন্দময়ী' নামে খ্যাত হন। এখানেই তাঁর সাধন-ভজন চলতে থাকে। ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে সিদ্ধেশ্বরীতে তাঁর আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। এটিই তাঁর আদি আশ্রম।

১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে মা আনন্দময়ী স্বামীসহ চলে যান দেরাদুনে। ফলে তাঁর লীলাক্ষেত্র ঢাকা থেকে স্থানান্তরিত হয় উত্তর ভারতে। সেখানে তাঁর দিব্যভাবের পরিচয় জানাজানি হলে অনেকে তাঁর ভক্ত হয়ে যান। ভারতের অনেক জ্ঞানী-গুণী তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। তাঁদের সঙ্গে মায়ের সাক্ষাৎ হয়েছে। এমনকি পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, মিসেস ইন্দিরা গান্ধী প্রমুখ ব্যক্তির সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে।

মা আনন্দময়ী নিজে ভগবৎপ্রেমী ছিলেন। তাই ভারতের জনগণকেও ভগবৎমুখী করার কাজে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তিনি উপমহাদেশের পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ সর্বত্র পরিভ্রমণ করেছেন। প্রাচীন ভারতের অনেক লুপ্ত তপোবন ও তীর্থস্থান তিনি পুনরুজ্জীবিত করেছেন। ভারতীয় সংস্কৃতির মর্মস্থল, সহস্র ঋষির তপোভূমি নৈমিষারণ্যকে তিনি জাগিয়ে তোলেন। এখন সেখানে কীর্তন, নাচ, গান, ধর্মগ্রন্থপাঠ, সৎসঙ্গ ইত্যাদি কর্মকাণ্ড চলছে। এভাবে তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থানের সুপ্ত, লুপ্ত ধর্মস্থানকে জাগ্রত করেছেন। সেখানে যাগ-যজ্ঞ, মন্দির, বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এদেশের লক্ষ-লক্ষ মানুষকে সনাতন ধর্মের ভাবধারায় উজ্জীবিত করে তুলেছেন। মানুষের মনকে ভগবৎমুখী করার জন্য অশেষ প্রেরণা দিয়ে গেছেন। বাংলাদেশের রমনা ও খেওড়ার দুটি আশ্রমসহ ভারতের বিভিন্ন স্থানে তিনি ২৫টি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন। হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে এটি মায়ের সবিশেষ উল্লেখযোগ্য অবদান। মা আনন্দময়ী বলতেন, 'যে যে অবস্থায় আছ, সেই অবস্থায় থেকেই কর্ম করে যাও। নাম করো, শুধু নাম। নামেই সব হয়।'

১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দের ২৭এ আগস্ট মা আনন্দময়ী পরলোক গমন করেন। হরিদ্বারে কণখল আশ্রমে গঙ্গার তীরে তাঁর মরদেহ সমাধিস্থ করা হয়।

মা আনন্দময়ীর জীবনী থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, সর্বদা ভগবানের নাম নিতে হবে। তাঁর নামে সবকিছু করতে হবে। কর্তব্য কর্মে অবহেলা করা চলবে না। আমাদের ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। মায়ের এই শিক্ষা আমরা মেনে চলব।

একক কাজ: ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে মা আনন্দময়ীর অবদান সম্পর্কে লেখো।

নতুন শব্দ: দিব্যভাব, পুনরুজ্জীবিত, সমাধিস্থ।

পাঠ ১৬ ও ১৭ : শ্রীলভক্তিবেদান্তস্বামী প্রভুপাদ

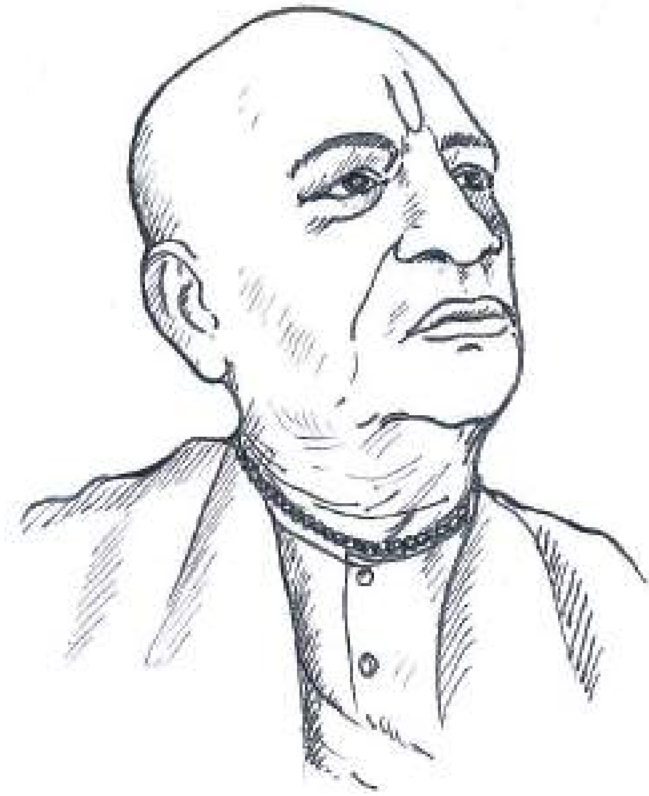

শ্রীলভক্তিবেদান্তস্বামী প্রভুপাদ ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দের উত্তর কলকাতার হ্যারিসন রোডের ১৫১ নং বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম গৌরমোহন দে এবং মায়ের নাম রজনী। প্রভুপাদের প্রকৃত নাম অভয়চরণ দে।

গৌরমোহন এক জ্যোতিষীকে দিয়ে পুত্রের কোষ্ঠী তৈরি করিয়েছিলেন। তিনি একটি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। এই শিশু ৭০ বছর বয়সে সমুদ্র পাড়ি দেবে। বিদেশ যাবে। একজন ধর্মপ্রচারক হিসেবে খ্যাতি লাভ করবে এবং ১০৮টি মন্দির প্রতিষ্ঠা করবে। তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রায় সবটাই সত্যে পরিণত হয়েছে। অভয়চরণ ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে ৬৯ বছর বয়সে আমেরিকায় যান। সেখানে হিন্দুধর্ম প্রচার করেন। ক্রমশ তাঁর খ্যাতি পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। কৃষ্ণনাম প্রচারের জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ', সংক্ষেপে যা 'ইসকন' নামে পরিচিত। আর তিনি পরিচিত হন 'শ্রীলভক্তিবেদান্তস্বামী প্রভুপাদ' নামে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তিনি শতাধিক মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

গৌরমোহন দে ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত বস্ত্র-ব্যবসায়ী। কিন্তু ব্যক্তিজীবনে তিনি ছিলেন একজন বিশুদ্ধ বৈষ্ণব। নিয়মিত কৃষ্ণনাম জপ করতেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ছিলেন তাঁর আদর্শ। চৈতন্য প্রবর্তিত 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম' ছিল তাঁর সাধনার মূল মন্ত্র। তিনি নিয়মিত শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করতেন। তিনি চাইতেন ছেলে অভয়চরণও তাঁর মতো বৈষ্ণব হোক। এজন্য তিনি তাঁকে নিয়মিত রাধা-কৃষ্ণ মন্দিরে নিয়ে যেতেন। বালক বয়সেই তাঁকে মৃদঙ্গ বাজানো সেখান। ভজন, কীর্তন ইত্যাদি শেখায় উৎসাহ দেন।

অভয়চরণের মা রজনী দেবী ছিলেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব পরিবারের কন্যা। তাই তাঁর মধ্যেও বৈষ্ণব ভাবের প্রকাশ ঘটে। তিনি ছিলেন পতিব্রতা ও ধর্মপরায়ণা একজন আদর্শ স্ত্রী ও জননী। বালক অভয়চরণ দেখতেন, তাঁর মা কী রকম সরলতা সহকারে সকলের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করতেন। পূজা-পার্বণ অনুষ্ঠান করতেন। মায়ের এই ভক্তি, সরলতা ও কর্তব্যপরায়ণতা বালক অভয়চরণের মনে গভীর প্রভাব ফেলে।

অভয়চরণ কোলকাতার স্কটিশচার্চ কলেজে স্নাতক শ্রেণির ছাত্র। এ সময় তাঁর বিয়ে হয়। স্ত্রীর নাম রাধারাণী দেবী। কিন্তু রাধারাণী পিত্রালয়েই অবস্থান করছিলেন, অভয়চরণের পড়াশোনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত।

তখন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ক্রমশ তীব্রতর হচ্ছিল। অভয়চরণের ওপর তার একটা প্রভাব পড়েছিল। একই কলেজে এক ক্লাস ওপরে পড়তেন সুভাষচন্দ্র বসু। তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেয়ার জন্য ছাত্রদের উৎসাহ দিতেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব, বক্তৃতা ও সাংগঠনিক ক্ষমতা দেখে অভয়চরণ মুগ্ধ হন। কিন্তু সরাসরি আন্দোলনে যোগ না দিলেও তবে ইংরেজদের শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি তাঁর একটা অনীহার ভাব সৃষ্টি হয়। এর চেয়ে তিনি ভারতের নিজস্ব শিক্ষাব্যবস্থাকে অধিকতর মঙ্গলজনক মনে করেন।

মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনের প্রতিও অভয়চরণ একটা আকর্ষণ অনুভব করতেন। মনোযোগ দিয়ে তিনি তাঁর বক্তৃতা- বিবৃতি শুনতেন এবং পাঠ করতেন।

১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে অভয়চরণ স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিন্তু এসময় মহাযাত্রা গান্ধীর নেতৃত্বে সংঘটিত অসহযোগ প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ডিগ্রি প্রদানের অনুষ্ঠান বর্জন করেন। এ ঘটনার পর পিতার ইচ্ছায় তিনি একটি ওষুধ কোম্পানিতে চাকরি নেন এবং ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে এই কাজেই সপরিবারে এলাহাবাদ চলে যান।

এলাহাবাদে এসে অভয়চরণের জীবনের মোড় ঘুরে যায়। এখানে তিনি শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর সঙ্গে অভয়চরণের ইতঃপূর্বে (১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে) কোলকাতায় একবার সাক্ষাৎ হয়েছিল। অভয়চরণ তখন স্বদেশি আন্দোলনের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন। সরস্বতী ঠাকুর তখন তাঁকে বলেছিলেন, 'এসব আন্দোলনের চেয়ে চৈতন্য মহাপ্রভুর বৈষ্ণব আন্দোলন অনেক কার্যকর। **'হরে কৃষ্ণ হরে রাম'** কীর্তন অতি সহজেই সকল শ্রেণির মানুষকে কাছে টানতে পারে। সংসারের সকল রকম দুঃখ-কষ্ট ভুলিয়ে শান্তি দিতে পারে। কলিযুগে জীবোদ্ধারের এটাই একমাত্র পথ।' সেই একই কথা ঠাকুর এবারও অভয়চরণকে বললেন। অভয়চরণ এবার গুরুর আদেশ শিরোধার্য করে কাজ শুরু করে দিলেন।

অভয়চরণ গুরুর উপদেশ ও নিজের আদর্শ প্রচারের জন্য Back to Godhead নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ শুরু করলেন। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা, শ্রীমদ্‌ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত তাঁর তিনটি প্রিয় গ্রন্থ ছিল। তিনি প্রথম দুটির ভাষ্য রচনা করেন। সবার কাছেই তা অত্যন্ত সমাদৃত হয়েছে। তিনি তাঁর পত্রিকা এবং গ্রন্থ তৎকালীন ভারতের বিখ্যাত মনীষীদের কাছে পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণান, লালবাহাদুর শাস্ত্রী প্রমুখ। এঁদের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎও করেছেন। এঁরা তাঁর কাজের উচ্চ প্রশংসা করেছেন।

অভয়চরণ এক সময় কৃষ্ণনাম বা কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের জন্য চাকরি, সংসার সব ছেড়ে দেন। ভারতের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ান। এক পর্যায়ে তিনি বৃন্দাবনে যান। সেখানে তিনি সন্ন্যাস-ধর্মে দীক্ষা নেন। তখন তাঁর নাম হয় 'অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্তস্বামী'। আরো পরে তিনি 'শ্রীলভক্তিবেদান্তস্বামী প্রভুপাদ' নামে খ্যাত হন।

১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর প্রভুপাদ শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র বৃন্দাবনে ইহলীলা সংবরণ করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ বিশ্বাস করতেন, সকল জাতির মধ্যে কৃষ্ণভাবনামৃত ছড়িয়ে দিতে পারলে কোনো জাতিভেদ থাকবে না। হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না। সবাই সবাইকে ভালোবাসবে। যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি ধ্বংসাত্মক কাজ থেমে যাবে। তাঁর গুরু সরস্বতী ঠাকুরও তাঁকে এ-কথাই বলেছিলেন। তিনি আরো বলেছিলেন, ভারতবর্ষের বাইরেও এই কৃষ্ণভাবনামৃত ছড়িয়ে দিতে হবে। তাহলে এর মাধ্যমে বিশ্বভ্রাতৃত্ব গড়ে উঠবে। একারণেই শ্রীল প্রভুপাদ ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে আমেরিকা যান। পরের বছর ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে নিউইয়র্কে প্রতিষ্ঠা করেন 'আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সঙ্ঘ' (ইসকন)। পর্যায়ক্রমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রভুপাদ মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এই সংস্থাটি পরিচালনা করেন। তিনি শতাধিক মন্দির, আশ্রম, স্কুল ও কৃষ্ণকেন্দ্রের সমন্বয়ে এটিকে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইসকনের ৩৫০টিরও বেশি মন্দির রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মায়াপুরে এর প্রধান মন্দির অবস্থিত। বাংলাদেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, কুমিল্লা প্রভৃতি শহরেও ইসকনের মন্দির রয়েছে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের হাজার হাজার মানুষ প্রভুপাদ প্রবর্তিত এই মতাদর্শে আকৃষ্ট হয়ে কৃষ্ণনামে দীক্ষিত হচ্ছেন। এভাবে তাঁরা একটি কৃষ্ণ-পরিবার তৈরি করে চৈতন্যদেব প্রবর্তিত বৈষ্ণবীয় জীবনাচার পালন করছেন। ইসকনের মূল উদ্দেশ্য কৃষ্ণনামের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনা জাগ্রত করা। পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা-ভালোবাসা সৃষ্টি করা। মানুষে-মানুষে ভেদাভেদ দূর করা। জ্ঞানের আলো দ্বারা অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার দূর করা। বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজ করা। শিশুদের মধ্যে শিক্ষা দান করা। দরিদ্রদের মধ্যে দাতব্য চিকিৎসা প্রদান করা। গীতার দর্শন ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মাধ্যমে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে দূরত্ব কমিয়ে আনাও ইসকনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

নতুন শব্দ: মৃদঙ্গ, স্কটিশচার্চ, ইসকন, গৌড়ীয় বৈষ্ণব, বৈষ্ণবীয় জীবনাচার ।

পরিকল্পিত কাজ: শিক্ষার্থী ওপরে বর্ণিত মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারীদের ছবি সংগ্রহ করবে । তাঁদের শিক্ষাসমূহ একটা কাগজে লিখে পড়ার টেবিলের সামনে টানিয়ে রাখবে, যাতে সব সময় তা চোখে পড়ে । পাঠ্য-বহির্ভূত অন্যান্য মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারীদের সম্পর্কেও জানার চেষ্টা করবে এবং তাঁদের ছবি সংগ্রহ করবে ।

নমুনা প্রশ্ন :

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. 'হাতে কাম মুখে নাম'–এ উপদেশটি কার?

ক. হরিচাঁদ ঠাকুরের

খ. ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের

গ . মা আনন্দময়ীর

ঘ .স্বামী বিবেকানন্দের

৩। নরেন্দ্রনাথের মনে পরিবর্তন দেখা দেয় কেন?

ক. ঘর সংসারে মন বসে না বলে

খ. সৃষ্টিকর্তা ও তার স্বরূপ সম্পর্কে চিন্তার কারণে

গ. স্বাধীনতা আন্দোলন ক্রমশ তীব্রতর হওয়ার ফলে

ঘ. মিথ্যা না বলা ও খারাপ লোকের সাথে না থাকার ফলে

২০২৫

উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

মনমোহনবাবু জনদরদি ও আদর্শ সংসারী মানুষ।তিনি নিজের উপার্জনের টাকা দিয়ে অনাথ আশ্রম ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। যেকোনো মূল্যে মানুষের উপকার করে থাকেন। তাঁর ধর্মপরায়ণ দাদা নারায়ণ বাবুও মানুষের জন্য নিবেদিত প্রাণ। বৃদ্ধাবয়সে তিনি দেশের বাইরে গিয়েও ধর্ম প্রচারের জন্য একটি সংগঠনের হয়ে কাজ করেন। তিনি বিশ্বের অন্যান্য জাতির মধ্যে কৃষ্ণ নাম ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টায় নিজেকে নিবেদন করেন। বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কাজও তিনি করে থাকেন।

৩. মনমোহনবাবুর আচরণে আদর্শ জীবনচরিতের কোন সাধকের আদর্শ ফুটে উঠেছে?

ক. স্বামী বিবেকানন্দ

খ. ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

গ. হরিচাঁদ ঠাকুর

ঘ. ঠাকুর নিগমানন্দ

৪. নারায়ণ বাবুর মতে তোমার পাঠ্যবইয়ের যে মহাপুরুষের জীবনী রয়েছে তাঁর আদর্শ হলো -

ক. মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের চেতনা জাগ্রত করা

খ. ভাষা ও সংস্কৃতির প্রসার ঘটানো

গ. যাগ - যজ্ঞের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করা

ঘ. ধর্মীয় ভাবধারার প্রতি উজ্জীবিত করা

সৃজনশীল প্রশ্ন:

কাননদেবী সাংসারিক কাজ ও ধর্মকর্ম সুনিপুণভাবে পালনের মাধ্যমেই আনন্দ পান। ব্যক্তিজীবনে তাঁর একটি বিশেষ আকাঙ্ক্ষা ছিল এমনভাবে রাধাগোবিন্দের মন্দির প্রতিষ্ঠা যেখানে দূরদূরান্তের মানুষ এসে রাত্রিবাস করতে পারে। তাঁর ইচ্ছাটি সার্থকভাবে পূরণ করতে পারিবারিক অর্থে তাঁর এলাকায় পুরাতন মন্দির সংস্কার ও একটি নতুন মন্দির প্রতিষ্ঠা করে রাধাগোবিন্দের পূজা ও পূজারীদের থাকার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তাঁর স্বামী বরুণ বাবু চাকরি হতে অবসর নেওয়ার পর হরিনামই এখন তাঁর ধ্যান জ্ঞান। তার মতো কয়েকজনকে নিয়ে একটা দল গঠন করে সারাক্ষণ কেবল হরিনাম নিয়েই তিনি মত্ত হয়ে থাকেন।

২০২৬

ক. ঠাকুর নিগমানন্দের দর্শন কী?

খ. দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলায় আহ্বান করেছিলেন কেন? ব্যাখ্যা করো।

গ. কাননদেবীর মধ্যে কোন মহীয়সী নারীর বৈশিষ্ট্য দেখা যায়? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. বরুণ বাবুর কার্যক্রমের মতো পাঠ্যপুস্তকে যে মহাপুরুষের জীবনী রয়েছে তার জীবনাদর্শ বিশ্লেষণ করো।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১. পৃথিবীতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কেনো অবতীর্ণ হয়েছিলেন?

২. ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের শিক্ষা সম্পর্কে লেখ।

৩. জীবসেবাই কলির একমাত্র ধর্ম-এটি কার বাণী? ব্যাখ্যা করো।

৪. মা আনন্দময়ীর জীবনী থেকে আমরা কী শিক্ষা পাই?

অষ্টম অধ্যায়

হিন্দুধর্ম ও নৈতিক মূল্যবোধ

ব্যক্তি, সমাজ বা জাতি ও বৈশ্বিক পর্যায়ে একজন ব্যক্তি বা জাতির আচরণ অন্য ব্যক্তি ও সমাজ বা জাতির প্রতি কেমন হবে, তা নির্ধারণের মাপকাঠিই হচ্ছে নৈতিক মূল্যবোধ। এই মূল্যবোধ কতিপয় গুণের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে, যেমন: মানবতাবোধ, সৎসাহস, ন্যায়বিচার, সৎসঙ্গ, সংযম, অহিংসা প্রভৃতি।

আমরা জানি, নৈতিক মূল্যবোধের মাপকাঠিতে বিচার করা যায় কে বা কোন জাতি কতটা সভ্য। ব্যক্তি ও সামাজিক ক্ষেত্রে ধর্ম নৈতিক মূল্যবোধ গঠনে সহায়তা করে। আবার নৈতিক মূল্যবোধ থেকে বোঝা যায়, কে কতটা ধর্মীয় মহৎ আদর্শ লালন করে। সুতরাং ধর্মের সঙ্গে নৈতিক মূল্যবোধের একটা নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য।

আমরা এ অধ্যায়ে নৈতিক মূল্যবোধের ধারণা এবং ন্যায়বিচার, সৎসঙ্গ, সংযম ও অহিংসা–এ মূল্যবোধগুলো হিন্দুধর্মের আলোকে ব্যাখ্যা করব। ব্যাখ্যা করব পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে এ সকল মূল্যবোধ গঠনের উপায়।

অহিংসা এবং সহিংসতা সম্পর্কে আলোচনা করব এবং এইডস রোগের কারণ, এর প্রভাব এবং এর প্রতিরোধের উপায় ব্যাখ্যা করব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- নৈতিক মূল্যবোধের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- হিন্দুধর্মের আলোকে ন্যায়বিচার, সৎসঙ্গ, সংযম ও অহিংসা–এ নৈতিক মূল্যবোধগুলো ব্যাখ্যা করতে পারব;
- পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ন্যায়বিচার, সৎসঙ্গ, সংযম ও অহিংসা–এ নৈতিক মূল্যবোধগুলো গঠনের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব;
- এইচআইভি/এইডসের কারণ, প্রভাব এবং এর প্রতিরোধে করণীয় এবং এইডস রোগে আক্রান্ত রোগীর সঙ্গে কীরূপ আচরণ করা উচিত, তা হিন্দুধর্মের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে আলোচিত নৈতিক মূল্যবোধগুলোর প্রতিফলন ঘটাতে উদ্বুদ্ধ হব।

পাঠ ১ : নৈতিক মূল্যবোধের ধারণা

আমরা জানি, 'নীতি' কথাটির অর্থ হচ্ছে কোনটা ভালো কাজ আর কোনটা মন্দ কাজ তা উপলব্ধি করে ভালো কাজ করায় উদ্বুদ্ধ হওয়া এবং ভালো কাজে আত্মনিয়োগ করার প্রবণতা। নীতির সঙ্গে জড়িত যে বিষয়, তাকে বলা হয় 'নৈতিকতা'। নৈতিক শিক্ষার অর্থ-'নীতি-সম্পর্কিত শিক্ষা'।

সত্য কথা বলা উচিত। তাই আমরা সবাই সর্বদা সত্য কথা বলব। গুরুজনদের ভক্তি করা কর্তব্য। তাই সবাই গুরুজনদের ভক্তি করব, তাঁদের সেবা করব। ঈশ্বরজ্ঞানে জীবের সেবা করব। কারণ জীবের মধ্যে আত্মারূপে ঈশ্বর বিরাজ করেন। এভাবে নৈতিক শিক্ষা থেকে জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে আমাদের যে নৈতিকতাবোধ জাগ্রত হয়, তার নাম মূল্যবোধ।

সকল মানুষেরই এ মূল্যবোধ থাকা প্রয়োজন। যদি কোনো ব্যক্তির মধ্যে বা সমাজে এর ঘাটতি দেখা দেয়, তাহলে আমরা বলি, মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটেছে। এ মূল্যবোধের প্রকাশ নানাভাবে ঘটতে পারে। যেমন; রুচি বা সৌন্দর্য সম্পর্কে মূল্যবোধ, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে মূল্যবোধ ইত্যাদি। ব্যক্তি, সমাজ বা জাতি এবং আন্তর্জাতিক–এ তিন পর্যায়েই নির্দিষ্ট মূল্যবোধ দ্বারা আমরা পরিচালিত হই। মূল্যবোধকে যখন নীতির সঙ্গে সম্পর্কিত করে দেখা হয়, তখন তাকে বলা হয় নৈতিক মূল্যবোধ।

'মূল্য' কথাটার দ্বারা মান বা পরিমাণ বোঝায়। মূল্যবোধ হচ্ছে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার বোধের একটা অংশমাত্র। সুতরাং এদিক থেকে 'নৈতিক মূল্যবোধ' মূল্যবোধের একটা মানকে নির্দেশ করে। যেমন–কোনো মানুষকে আমরা কেমন দৃষ্টিতে দেখব? তাই নৈতিক মূল্যবোধ বলে দেয় সবাইকে নিজের সমান জ্ঞান করতে হবে। কিন্তু আমরা অনেক সময় পেশা, বিত্ত, পদমর্যাদা প্রভৃতি বিবেচনা করে কারো সঙ্গে ব্যবহারের মান নির্ধারণ করি। এতে নৈতিক মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটে না। যখন মানুষকে প্রকৃত মর্যাদা ও সম্মান দিতে বিত্ত, পেশা, পদমর্যাদা, ধর্মমত বিবেচনায় না নিয়ে সাম্যের দৃষ্টিতে দেখি, তখন তার মধ্যে ঘটে নৈতিক মূল্যবোধের প্রকৃত প্রকাশ।

ধর্মের সঙ্গে নৈতিক মূল্যবোধের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। ধর্মসম্মত জীবন-যাপনের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধের প্রকাশ ঘটে। আবার নৈতিক মূল্যবোধগুলো ধর্মের অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হয়।

হিন্দুধর্ম নৈতিক মূল্যবোধের একটি উচ্চমান প্রত্যাশা করে। যিনি ধার্মিক, তাঁর আচরণের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধের প্রকাশ ঘটতেই হবে। কারণ নৈতিক মূল্যবোধগুলো ধর্মের অঙ্গ। এখানে আমরা হিন্দুধর্মের আলোকে ন্যায়বিচার, সৎসঙ্গ, সংযম, অহিংসা–এ মূল্যবোধগুলো সম্পর্কে জানব।

নতুন শব্দঃ উদ্বুদ্ধ, বিত্ত, প্রতিপালন।

পাঠ ২ : ন্যায়বিচার

একসঙ্গে বসবাস করতে গিয়ে মানুষ যে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে, তার নাম সমাজ। সমাজে সকলকে মিলেমিশে থাকতে হয়। কিন্তু নানা কারণে সমাজের সদস্যদের মধ্যে মতের অমিল দেখা দেয়। মতের অমিল মনের অমিলে পরিণত হয়ে ঝগড়া পর্যন্ত গড়ায়। তখন দুপক্ষের মধ্যে কে সঠিক এবং কে সঠিক নয়, তা নির্ণয় করতে হয়। আবার দুপক্ষের মধ্যে কাউকে অভিযুক্ত করলেই তাকে দণ্ড দেওয়া যায় না। আসলেই সে অপরাধী কি না তা নির্ধারণ করতে হয়। কোনো বিষয়ে কে সঠিক এবং কে ভ্রান্ত, অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধী না নিরপরাধ—এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের যে পদ্ধতি, তার নাম বিচার।

বিচারের সময় বিচারককে অবশ্যই নিরপেক্ষ থাকতে হয়। তাঁকে নির্ভুলভাবে বিচার করতে হয় কে সঠিক আর কে সঠিক নয়, কিংবা অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধী না নিরপরাধ। কোনো পক্ষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব না দেখিয়ে নীতি এবং ধর্ম বা আইনের আলোকে বিচার করার নাম ন্যায়বিচার।

ন্যায়বিচার সমাজকে সুপথে পরিচালিত করার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। বিচারক যখন বিচার করেন, তখন কে পুত্র, কে বন্ধু, কে আত্মীয় তা দেখেন না। তাঁকে ন্যায়-নীতি, ধর্ম বা আইন এবং যুক্তির দ্বারা পরিচালিত হতে হয়। সেখানে শ্রদ্ধা, স্নেহ, ভালোবাসা প্রভৃতি আবেগের কোনো স্থান নেই। অভিযুক্ত ব্যক্তির জন্য কষ্ট পেলেও বিচারককে ন্যায়বিচার করতে হয়। এ বিষয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন:

দণ্ডিতের সাথে দণ্ডদাতা কাঁদে যবে
সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার।

আমরা বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদের কথা জানি। তিনি দৈত্যকুলে জন্ম নিয়েও বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। ন্যায়বিচারের জন্যও তিনি প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন। এখন মহাভারত থেকে তাঁর ন্যায়বিচারের একটি উপাখ্যান জানব।

পাঠ ৩ : প্রহ্লাদের ন্যায়বিচার

বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদ রাজত্ব করছেন। তাঁর সুশাসনে প্রজারা সুখেই আছে। তাঁর ছেলে বিরোচন। বিরোচন রাজপুত্র বলেই হোক আর নিজের চরিত্রের জন্যই হোক, কিছুটা উদ্ধত আর অহংকারী। তখন রাজধানীতে সুধন্বা নামে এক তরুণ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর সঙ্গে রাজপুত্র বিরোচনের সম্পর্ক ভালো ২০২৬

ছিল না। একবার দুজনের মধ্যে কে জ্ঞানে ও গুণে অগ্রগণ্য তা নিয়ে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। তখন বিরোচন বলেন, 'চল, আমরা বিদ্বান ব্যক্তিদের ওপর এ বিষয়ে বিচারের ভার অর্পণ করি।'

তখন সুধন্বা বললেন, 'রাজা হলেন শাসক। সুতরাং রাজার কাছেই বিচার প্রার্থনা করা উচিত। চল, আমরা তোমার পিতা মহারাজ প্রহ্লাদের কাছে যাই। আশা করি তিনি ন্যায়বিচার করবেন।'

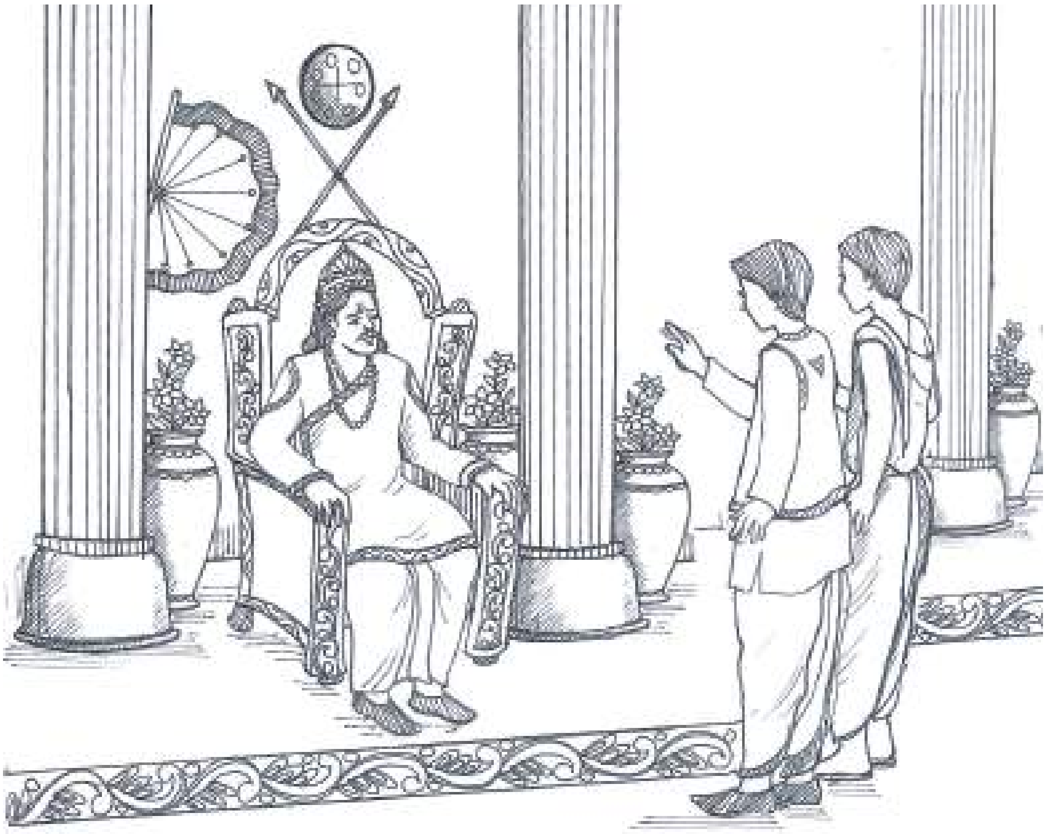

দুজনে মহারাজ প্রহ্লাদের কাছে গিয়ে বিচার প্রার্থনা করলেন। মহারাজ প্রহ্লাদ সব শুনে বললেন, 'রাজপুত্র বিরোচন শক্তিমান ও বুদ্ধিমান, কিন্তু তার ঔদ্ধত্য ও অহংকার তার চরিত্রকে কিছুটা মলিন করেছে যেমন চাঁদের রয়েছে কলঙ্ক।'

বিরোচন: পিতা!

প্রহ্লাদ: হ্যাঁ পুত্র। বাধা দিও না, আমাকে বলতে দাও।

প্রহ্লাদ: ব্রাহ্মণকুমার সুধন্বা ধর্মপরায়ণ, সত্যবাদী এবং ধৈর্য ও সংযমের বলে

বলীয়ান। অহিংসা তার চরিত্রকে আরও উজ্জ্বল করেছে। সুতরাং তোমাদের দুজনের মধ্যে সুধন্বাই জ্ঞানে ও গুণে অগ্রগণ্য।

পুত্রের প্রতি পক্ষপাতিত্ব না দেখিয়ে নিরপেক্ষভাবে প্রহ্লাদের এ বিচার ন্যায়বিচারের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

একক কাজ: প্রহ্লাদের ন্যায়বিচারের শিক্ষা তুমি কীভাবে জীবনাচরণে প্রয়োগ করবে?

পাঠ ৪ ও ৫ : সৎসঙ্গ

সৎসঙ্গ হচ্ছে সৎ লোকের সান্নিধ্য। সৎ লোকের সঙ্গে চলা-ফেরা, ওঠা-বসা কিংবা জীবন-যাপন। সৎসঙ্গ অত্যন্ত মধুর। সৎলোকের সঙ্গে থাকলে নিশ্চিন্ত থাকা যায়। কারণ সৎ লোক কারো ক্ষতি তো করেনই না, বরং পারলে উপকার করেন। তাই তো প্রবচন আছে, **'সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে সর্বনাশ'**।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বহুবার সৎসঙ্গের কথা ভক্তদের বলেছেন। তিনি বলেছেন যে, সৎসঙ্গ মনকে পবিত্র করে, চরিত্রকে উন্নত করে এবং ভক্তিভাব জাগ্রত করে।

আমরা শুনেছি পরশপাথর লোহাকে স্বর্ণে পরিণত করে। তেমনি সৎসঙ্গ দুর্বৃত্তকেও সৎ ও মহৎ করে তোলে। এ সম্পর্কে একটি কাহিনি বলছি:

সাধু ও শ্রীধর

ছায়াসুনিবিড় সুন্দর একটি গ্রাম। সেখানে বাস করত একটি কিশোর। নাম তার শ্রীধর। ভীষণ দুষ্ট ছিল সে। অল্পতেই রেগে যেত। ঝগড়া লাগিয়ে মারামারি করত। এমনকি চুরি করতেও তার কোনো কুণ্ঠা ছিল না।

শ্রীধর একদিন ঘুরতে ঘুরতে এলো বদরিকা আশ্রমে। বিখ্যাত আশ্রম। কত মন্দির, কত ধর্মশালা, কত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

সেখানকার এক মন্দিরে গেল সে। দেখল, মন্দিরের বিগ্রহের গলায় ঝুলছে মুক্তার মালা। রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করল সে। তারপর গভীর রাতে সুকৌশলে চুরি করল দেববিগ্রহের গলার সেই মুক্তার মালা। চুরি করে সেখান থেকে পালাল সে। সুন্দর মালাটি গলায় পরে সে পথ চলতে লাগল। ঘুরতে ঘুরতে সে এলো এক সাধুর আশ্রমে।

সাধু তাঁর সাধনার পাশাপাশি অন্যের সেবা-শুশ্রূষা করেন। বলেন, জীবকে সেবা করলে ঈশ্বরকে সেবা করা হয়।

সাধু শ্রীধরকে বললেন, 'আমার একটা উপকার করতে পারবে, বাবা?'

শ্রীধর: 'কী করতে হবে বলুন।'

সাধু তখন তাঁর ঝোলা থেকে একটি মুক্তা বের করে বললেন, 'এ মুক্তাটি একজনের মালা থেকে খসে পড়েছে। মালার মালিক বদরিকা আশ্রম থেকে এসেছেন। তিনি চলছেন তাঁর দেশে। মুক্তাটি আমি তোমায় দিচ্ছি। পথ চলতে যদি দেখা হয়, তাহলে ওটা তাঁকে দিয়ে দিও।'

শ্রীধর মুক্তাটি হাতে নিল। তারপর নিজের মালায় হাত দিয়ে দেখল, মুক্তাটি তার গলার মালা থেকেই খসে পড়েছে। কখন কীভাবে পড়েছে, তা সে নিজেই জানে না।

শ্রীধর: 'আপনি কেমন করে জানলেন যে আমার গলার মালা থেকেই মুক্তা খসে পড়েছে? কিন্তু মালাটি আমার নয়, আমি এটা বদরিকা আশ্রমের এক দেববিগ্রহের গলা থেকে চুরি করেছি। এখন কী করব আমি?'

একথা বলেই সে কাঁদতে লাগল।

সাধু বুঝলেন, অসৎ হৃদয়ে সততার উদয় হয়েছে। তিনি শ্রীধরকে বললেন, 'বাবা শ্রীধর, একবার পাপ করলে যে চিরকাল করতে হবে, তা নয়। এসো, পুণ্যের পথে এসো। দেবতার মালা তুমি দেবতাকে ফিরিয়ে দিয়ে এসো। তাহলে তিনিই তোমাকে ক্ষমা করবেন।'

সাধুর কথামতো শ্রীধর বদরিকা আশ্রমে গেল। কাউকে না জানিয়ে দেববিগ্রহের গলায় সেই মুক্তার মালাটি পরিয়ে দিলো। তারপর বাড়ি না গিয়ে ফিরে গেল সেই সাধুর আশ্রমে।

শ্রীধর সাধুর সঙ্গে থাকে। সাধু প্রতিদিন ভোরে স্নান করেন। শ্রীধরও প্রতিদিন ভোরে উঠে স্নান করা শুরু করল। সে লেগে পড়ল আশ্রমের নানা কাজে।

একদিন নদীতে একটি বিড়ালকে হাবুডুবু খেতে দেখে সে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। তুলে আনল বিড়ালটিকে। আরেকদিন সংক্রামক ব্যাধিতে মৃত এক ভিখারির শব (মাতৃদেহ) কাঁধে করে শ্মশানে নিয়ে গেল সে। এভাবে আর্তের সেবায় ব্রতী হলো শ্রীধর।

২০২৬

একদিন সে সাধুর অনুমতি নিয়ে বাড়ি গেল। তাকে দেখে কেউ চিনতে পারল না। পারবে কী করে? সে তো আর আগের শ্রীধর নেই। সে এখন তরুণ সাধক। তবে তার মা তাকে চিনলেন। তিনি বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, 'শ্রীধর, তুই!'

শ্রীধর: 'হ্যাঁ মা, আমি। আমি তোমার শ্রীধর।'

দুর্বৃত্ত শ্রীধর নয়, চোর শ্রীধর নয়। সে এখন সৎ ও সেবাব্রতী শ্রীধর।

সৎসঙ্গ এভাবে দুর্বৃত্তকে সৎ ও সেবাব্রতী এক মহান মানুষে পরিণত করতে পারে। সৎসঙ্গের এমনই মহিমা।

দলীয় কাজ: শ্রীধরের শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজজীবনে কী প্রভাব ফেলতে পারে তা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করো।

নতুন শব্দ: কুণ্ঠা, ধর্মশালা, বিগ্রহ, শব, ব্রতী, দুর্বৃত্ত, সেবাব্রতী।

পাঠ ৬ ও ৭ : সংযম

'সংযম' কথাটির অর্থ হলো নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা। শাস্ত্রে হিন্দুধর্মের যে দশটি লক্ষণের কথা বলা হয়েছে, 'দম' ও 'ইন্দ্রিয়নিগ্রহ' সেগুলোর অন্তর্গত। 'দম' মানে দমন করা। 'ইন্দ্রিয়নিগ্রহ' মানে ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ করা। ইন্দ্রিয়ের দাবি অনুসারে না চলে নিজের ইচ্ছেমতো চলাকেই বলে 'ইন্দ্রিয়নিগ্রহ'।

একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে। ধরা যাক, বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠান চলছে। একটি ঘরে প্রচুর দই-মিষ্টি এনে রাখা হয়েছে। আমি ঐ ঘরে ঢুকলাম। ঘরে আর কেউ নেই। আমার লোভ হলো, ওখান থেকে একটা মিষ্টি তুলে খাই। কেউ তো আর দেখছে না। পরক্ষণেই চিন্তা হলো, মানুষ না-হোক ঈশ্বর তো দেখছেন। তাছাড়া চুরি করা অনৈতিক কাজ। তাই আমি লোভকে দমন করলাম। এর মধ্য দিয়ে আমার জিহ্বা নামক ইন্দ্রিয়কে নিগ্রহ বা নিয়ন্ত্রণ করা হলো। দম ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহকে একসঙ্গে সংযম বলা হয়।

সংযম তপস্যার অংশ। তপস্যা হচ্ছে লক্ষ্য অর্জনের জন্য সযত্ন প্রচেষ্টা। যোগশাস্ত্রে বলা হয়েছে, ধর্মের চারটি ভিত্তি—তপস্যা, শৌচ, দয়া ও সত্য। তপস্যাই মূল ধর্ম। অপর তিনটি তপস্যার অংশ বলে বিবেচিত। তপস্যার আবার প্রকারভেদ আছে, যেমন—শারীরিক তপস্যা, বাচিক তপস্যা, মানসিক তপস্যা ইত্যাদি। শীত, গ্রীষ্ম, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ইত্যাদি সহ্য করা, দেবতাদের পূজা

২০২৬

করা, গুরুজনদের শ্রদ্ধা করা, সরলতা, অহিংসা প্রভৃতি শারীরিক তপস্যা। সত্য, প্রিয় ও হিতকর বাক্যের প্রয়োগ এবং শাস্ত্রপাঠকে বলা হয় বাচিক তপস্যা। আর চিত্তের প্রসন্নতা, অনিষ্ঠুরতা, বাকসংযম ও আত্মসংযম (নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা), ছল-চাতুরী না করা ইত্যাদি হচ্ছে মানসিক তপস্যা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সংযম তপস্যার অংশ এবং ধর্মেরও অঙ্গ।

সংযম ছাড়া জীবন হালহীন নৌকা বা বল্গাহীন ঘোড়ার মতো। কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। ফলে জীবনে আসে উচ্ছৃঙ্খলতা। সংযম আমাদের চরিত্রকে শৃঙ্খলামণ্ডিত ও মহৎ করে। সুতরাং সংযম-সাধনা সিদ্ধিলাভের অন্যতম প্রধান উপায়।

সংযম ব্রহ্মচর্যের অংশ। সংযমের মধ্য দিয়ে গুরুগৃহে শিক্ষাজীবন অতিবাহিত করার সময়কালকে শাস্ত্রে ব্রহ্মচর্য বলা হয়েছে। সুতরাং সংযম হচ্ছে ছাত্রজীবনের একটি অঙ্গ।

সংযম না থাকলে ব্যক্তিগত ও সামাজিক যেকোনো কাজ পণ্ড হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই তো বলা হয়, সংযম হারিয়ে রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন।

সংযমকে সারা জীবনের সঙ্গী করতে হবে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে সংযম বজায় রাখতে হবে। সংযম জীবনের সহায়ক। পরমতসহিষ্ণু হতে হলেও সংযমের অভ্যাস করতে হবে। সংযম ও পরমতসহিষ্ণুতা ব্যক্তি-জীবন ও সমাজ-জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে অপরিহার্য।

একক কাজঃ জীবনে সংযমের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখো।

নতুন শব্দঃ দম, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, তপস্যা, শৌচ, বাচিক, হিতকর, প্রসন্নতা, বাকসংযম, ছল-চাতুরী, হালহীন, বল্গাহীন, সিদ্ধিলাভ।

পাঠ ৮ : অহিংসা

জীবকে পীড়ন ও হত্যা না-করাকে বলা হয় অহিংসা। যোগশাস্ত্রে যম (সংযম), নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি নামে আটটি অঙ্গের কথা বলা হয়েছে। যম বা সংযম অহিংসার ভিত্তি।

সহিংসতা অহিংসার বিপরীত। জীবকে পীড়ন বা হত্যা করার প্রবৃত্তিকে বলে সহিংসতা।

২০২৫

আমরা বিত্ত, খ্যাতি, প্রতিপত্তি, যশ ইত্যাদি পেতে চাই । আর এগুলো পাওয়ার পথে যারা বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তাদের প্রতি সহিংস আচরণ করি । এ আচরণ অনৈতিক ।

সহিংসতা সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং মানুষকে কষ্ট দেয় । অনেক সময় সহিংসতা প্রাণ হরণেরও কারণ হয় । সুতরাং সহিংসতা অধর্ম ।

মনুসংহিতায় বলা হয়েছে, যিনি নিষ্ঠুর আচরণ করেন না, কাউকে হিংসা করেন না, তিনি স্বর্গলোক জয় করতে পারেন (৪/২৪৬) । মনুসংহিতা থেকে অহিংসা সম্পর্কে আরও জানতে পারি যে, যিনি অহিংস, তিনি ধর্মকৃত্যসহ সকল সৎকাজে সাফল্য লাভ করেন (৫/৪৫) ।

শুধু মনুসংহিতায়ই নয়, হিন্দুধর্মের বিভিন্ন গ্রন্থে অহিংসা সম্পর্কে বিস্তর আলোচনা করা হয়েছে । অহিংসা যম (সংযম) নামক যোগের অংশ হিসেবে সাধনা বা তপস্যার সহায়ক, ইহলোকের অবলম্বন এবং মোক্ষলাভের অন্যতম প্রধান উপায় । তাই তো বলা হয়: **'অহিংসা পরম ধর্ম'**। মহাভারতে যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিতে গিয়ে ভীষ্ম বলেছেন, সকল জীবে অহিংসা পরম ধর্ম বলে জানবে ।

হিংসার পরিণাম শুভ হয় না । কৌরবেরা পাণ্ডবদের হিংসা করতেন । তাই তাঁদের পরিণাম শুভ হয়নি ।

তবে অহিংসা বলতে কিন্তু কাপুরুষতা বা ভীরুতাকে বোঝায় না । নির্বিচার ক্ষমাও বোঝায় না । ন্যায়বিচার করে অপরাধীর শাস্তিদান হিংসা বলে গণ্য হবে না ।

নিজের স্বার্থে পরপীড়ন, পরের ক্ষতি করার চেষ্টা বা কাউকে হত্যা করাকেই সহিংসতা বলা হয়েছে। সুতরাং পরপীড়ন না-করাই অহিংসা । অহিংসা ব্যক্তিকে মহান করে, সমাজে শান্তি আনে । অহিংসা ধর্মের অঙ্গ এবং একটি অনুসরণীয় নৈতিক মূল্যবোধ ।

নতুন শব্দ: যোগশাস্ত্র, প্রবৃত্তি, ইহলোক, মোক্ষলাভ, কৌরব, পাণ্ডব ।

পাঠ ৯ : পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ন্যায়বিচার, সৎসঙ্গ, সংযম ও অহিংসা- এ মূল্যবোধগুলো অর্জনের উপায়

ন্যায়বিচার

বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদের আদর্শ অনুসরণ করে আমরা পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ন্যায়বিচার নামক মূল্যবোধ অর্জন করতে পারি। মহাভারতে আছে, অযোধ্যার রাজা সত্যকামের পিতা রাজা দ্যুমৎসেন মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য কয়েকজন অপরাধীকে সত্যকামের কাছে পাঠিয়েছিলেন। সত্যকাম তখন বলেছিলেন, অপরাধীর কার্য নীতিশাস্ত্র অনুসারে বিচার না করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া অন্যায়। সত্যকামের কথার মধ্যে ন্যায়বিচারের আদর্শের প্রতিফলন হয়েছে। সুতরাং ধর্মগ্রন্থ থেকে আমরা যদি ন্যায়বিচারের আদর্শ গ্রহণ করি, তাহলে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ন্যায়বিচারের মূল্যবোধ অর্জন করা সম্ভব হবে।

সৎসঙ্গ

সৎসঙ্গের আদর্শও আমরা ধর্মগ্রন্থ থেকে পাই। অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করে আমরা যদি সৎসঙ্গ করি, তাহলে সৎসঙ্গের মূল্যবোধ অর্জিত হবে। সৎসঙ্গ কেবল পুথিগত বিদ্যার বিষয় নয়, তা আচরণীয় বিষয়, জীবনে প্রয়োগ করার বিষয়।

সংযম

সংযম অষ্টাঙ্গ যোগের অন্যতম। পরিবার ও সমাজের সকল সদস্য যদি প্রতিনিয়ত সংযত আচরণ করে, তাহলে পরিবার ও সমাজজীবনে সংযম নামক মূল্যবোধটি অর্জিত হবে। আর এ সংযত মানুষদের আচরণ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আচরণেও প্রতিফলিত হবে। সুতরাং সংযত আচরণের অনুশীলনই সংযম নামক মূল্যবোধটি অর্জনের উপায়।

অহিংসা

অহিংসা অষ্টাঙ্গ যোগের অঙ্গ। অহিংসা ছাড়া ধর্মাচরণ সম্ভব নয়। অহিংসাও অনুশীলনসাধ্য। কোনো অবস্থাতেই আমরা জীবকে হিংসা করব না। জীবকে ব্রহ্ম জ্ঞান করব। তাহলে আর মনে হিংসার জন্ম হবে না। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার উপদেশ অনুসরণ করে ক্রোধ ও ঈর্ষাকে দূরে রাখব। মনের মধ্যে সর্বদা থাকবে সন্তোষ। সুখ ও দুঃখকে সমানভাবে গ্রহণ করব। প্রাপ্তিতে অহংকারী হব না, অপ্রাপ্তিতেও ভেঙে পড়ব না। এভাবে জীবন-যাপন করলে অহিংস হবই।

মোটকথা, উপলব্ধি ও অনুশীলনই যেকোনো প্রকার মূল্যবোধ অর্জনের প্রকৃষ্ট উপায়। একথা মনে রেখে আমরা বাস্তব জীবনে তার প্রতিফলন ঘটাতে সচেষ্ট থাকব।

নতুন শব্দ: অষ্টাঙ্গ, অনুশীলনসাধ্য, ঈর্ষা, অপ্রাপ্তি।

পাঠ ১০, ১১ ও ১২ : এইচআইভি/এইডস ও তার প্রতিকার

এইডস ও এইচআইভি-র ধারণা

নৈতিকতার বিপরীত প্রবৃত্তি হচ্ছে অনৈতিকতা। মানুষ যেমন ভালো কাজ করে, তেমনি মন্দ কাজেও লিপ্ত হয়। সাদার বিপরীতে যেমন কালো থাকে, তেমনি আলোর বিপরীতে থাকে অন্ধকার। আমাদের নৈতিক মূল্যবোধের পাশাপাশি অনৈতিক কাজ সম্পর্কেও ধারণা অর্জন করতে হবে। অনৈতিক কাজ সম্পর্কে জানা থাকলে আমরা তা থেকে বিরত থাকার জন্য সতর্ক হতে পারব। আমরা ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে ধূমপান ও মাদকাসক্তির মতো অনৈতিক কাজ সম্পর্কে জেনেছি। এ শ্রেণিতে আমরা এখন এমন একটি রোগ সম্পর্কে জানব, যার উৎস কয়েকটি অনৈতিক কাজ। রোগটির নাম এইডস।

এইডস একটি মারাত্মক রোগ। এইডসে আক্রান্ত হলে রোগীর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়। ফলে রোগী নানা প্রকার রোগে ঘনঘন আক্রান্ত হতে থাকে। এ-রোগ এখন পর্যন্ত নিরাময়যোগ্য নয়। তাই শেষ পর্যন্ত রোগীর অকাল মৃত্যু ঘটে।

এইডসের কথাটি ইংরেজি – AIDS। এর পূর্ণরূপ হলো:

A = Acquired
I = Immune
D = Deficiency
S = Syndrome

Acquired **I**mmune **D**eficiency **S**yndrome, সংক্ষেপে AIDS (এইডস)।

এইডস রোগ হয় এক প্রকার অতি ক্ষুদ্রাকৃতির জীবাণু থেকে, যাকে চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা বলেন ভাইরাস। ভাইরাসটির নাম এইচআইভি, ইংরেজিতে – HIV। এর পূর্ণরূপ হলো: **H**uman **I**mmunodeficiency **V**irus।

এইডসের কারণ :

ক. শরীরে এইচআইভি ভাইরাস আছে এমন কারও রক্ত যদি অন্যের শরীরে সঞ্চালন করা হয়, তাহলে রক্ত গ্রহণকারী ব্যক্তির এইডসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে। এইডসে আক্রান্ত একজনের ব্যবহার করা সিরিঞ্জ বা সুঁই যদি অন্যজন ব্যবহার করে তাহলে এইচআইভি ভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি থাকে। যারা ইনজেকশনের মাধ্যমে নেশা করে, তারা এভাবে এইডস-এ আক্রান্ত হতে পারে। যেহেতু রক্তের মধ্য দিয়ে এইচআইভি সংক্রমিত হয়, সেহেতু এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহার করা ব্লেড, ক্ষুর, চাকু ইত্যাদির মাধ্যমেও এ জীবাণু ছড়াতে পারে।

খ. এইডসের আরও একটি কারণ হচ্ছে যৌনমিলন। এইচআইভি ভাইরাস বহন করছে, এমন কারও সঙ্গে যৌনমিলন করলে তাহলে তার এইডসে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

গ. গর্ভকালীন বা গর্ভাবস্থায়, প্রসবকালে এবং জন্মের পরে এইডস অক্রান্ত মায়ের বুকের দুধের মাধ্যমে শিশুর শরীরে এইচআইভি সংক্রমণের আশঙ্কা থাকে।

তবে এইডস ছোঁয়াচে রোগ নয়। এইডসে আক্রান্ত রোগীর সঙ্গে দৈনন্দিন সাধারণ কাজকর্ম করলে এইডস হওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই।

এইডস-এ আক্রান্ত রোগীর সঙ্গে কোলাকুলি করলে, একই টয়লেট ব্যবহার করলে, তার কফ বা সর্দি থেকে কিংবা তার চোখের জল বা ঘাম থেকে এইচআইভি সংক্রমণের কোনো সম্ভাবনা নেই। এইচআইভি সংক্রমণ হয় রক্ত, যৌনমিলন এবং আক্রান্ত মায়ের বুকের দুধের মাধ্যমে।

এইচআইভি/এইডসের প্রভাব :

১. স্বাস্থ্যসেবার ওপর প্রভাব

ক. এইচআইভি/এইডস জনস্বাস্থ্যগত মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি করে।

খ. স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দের একটা বড় অংশ আক্রান্তদের পেছনে ব্যয় করতে হয়।

গ. একজন এইচআইভি ভাইরাস বহনকারীর দ্বারা বাহিত হয়ে এইডস রোগ অন্যদের সংক্রমিত করতে পারে।

২. অর্থনৈতিক প্রভাব

ক. উৎপাদন খাত ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

খ. পর্যটন খাত ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৩. সামাজিক প্রভাব

ক. অনাথ বা এতিম ও বিধবাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

খ. সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধন শিথিল হয়।

গ. এইডসে আক্রান্ত ব্যক্তিকে সমাজের অধিকাংশ লোক ঘৃণার চোখে দেখে। আক্রান্ত ব্যক্তিও লজ্জায় রমে মরে থাকে।

ঘ. জীবনে বঞ্চনা, হতাশা, অবিশ্বাস, ভয় ও অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি পায়।

এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধের উপায়ঃ

যেসব কারণে এইচআইভি সংক্রমিত হয়ে এইডস রোগের সৃষ্টি করে, সেগুলো পরিহার করতে হবে, যেমন–

১. রক্ত গ্রহণ করার সময় দেখতে হবে রক্তদাতা এইচআইভি বহন করছে কি না। এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত গ্রহণ করা যাবে না।

২. অবিবাহিত জীবনে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করতে হবে।

৩. বিবাহিত জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেই যৌনমিলন ঘটবে। অবৈধ যৌনমিলন থেকে সর্বদা বিরত থাকতে হবে।

হিন্দুধর্মে ছাত্রজীবনে কঠোর ব্রহ্মচর্য পালনের বিধান রয়েছে। মনুসংহিতায় পরদারগমন নামক পাপকে পঞ্চমহাপাপের অন্যতম বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এ-ধর্মে মাদকাসক্তিকে কেবল বর্জন করতেই বলেনি, মাদকাসক্তের সংসর্গে যাওয়া বা থাকাকেও মহাপাপ বলে গণ্য করা হয়েছে। সুতরাং হিন্দুধর্মের বিধি-বিধান তথা অনুশাসন যথাযথভাবে মেনে চললে শুধু এইডসই নয়, যেকোনো রকম যৌনরোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকবে না।

আমাদের দেহ তো আত্মারূপে বিরাজমান ঈশ্বরের মন্দির। আমরা বাইরের মন্দির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র রাখি। তাহলে দেহমন্দিরকে পবিত্র রাখব না কেন? আর দেহমন্দিরকে পবিত্র রাখলেই এইচআইভি/এইডস থেকে মুক্ত থাকতে পারব।

এইচআইভি/এইডসে আক্রান্ত রোগীর প্রতি আচরণ:

হিন্দুধর্ম বলে, **'পাপকে ঘৃণা করো, পাপীকে নয়।'** তাই আমরা এইডস রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে মমতাময় আচরণ করব। একজন স্বাভাবিক মানুষ থেকে তাঁকে আলাদা করে দেখব না। তাঁর মানবিক মর্যাদাকে খাটো করে দেখব না। কারণ আমরা জানি, এইডস সংক্রামক রোগ নয়। তাই এইডসে আক্রান্ত ব্যক্তিকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই।

আমরা একজন এইচআইভি/এইডসে আক্রান্ত রোগীর সঙ্গে এমন ব্যবহার করব, যাতে তাঁর স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত না হয়। তিনি যেন স্বাভাবিকভাবে সকল কাজ করতে পারেন। তাঁর মন যেন প্রফুল্ল থাকে। হিন্দুধর্ম জীবকে ব্রহ্মজ্ঞানে সেবা করতে বলেছে। এইডস রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিও যেন সে-সেবা থেকে বঞ্চিত না হন।

দলীয় কাজ: এইডসে আক্রান্ত রোগীদের প্রতি করণীয় বিষয়গুলো লিখে একটি পোস্টার তৈরি করো।

নতুন শব্দ: নিরাময়যোগ্য, সিরিঞ্জ, ব্লেড, ক্ষুর, গর্ভকালীন, প্রসবকালে, ছোঁয়াচে, পরদারগমন, পঞ্চমহাপাপ, দেহমন্দির।

নমুনা প্রশ্ন :

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা কোন নৈতিক মূল্যবোধের অন্তর্ভুক্ত?

ক. সৎসঙ্গ

খ. সংযম

গ. অহিংসা

ঘ. ন্যায়বিচার

২. 'এইডস' প্রতিরোধের জন্য প্রয়জন–

ক. ধর্মের বিধিনিষেধ মেনে জীবন যাপন করা

খ. প্রতিদিন জীব সেবা করা

গ. সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা

ঘ. জীবনে সুখ দুঃখকে সমানভাবে গ্রহণ করা।

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
শ্রেয়া দেখল কয়েকটি ছেলে একটি দরিদ্র শিশুকে মন্দির হতে তাড়িয়ে দিচ্ছে। সে ছেলেগুলোকে বুঝিয়ে ছোট শিশুটিকে মন্দিরের ভেতর নিয়ে পূজা দেখতে সাহায্য করলো। সে পশুপাখিও ভালোবাসে। শিখর শ্রেয়ার ছোট ভাই। শিখর আগে পশুপাখি ভালোবাসতো না। কিন্তু দিদির দেখাদেখি এখন সেও বাড়িতে পাখি পোষে।

৩. শিখরের মধ্যে কোন গুণটি কাজ করেছে?

ক. অহিংসা

খ. ন্যায়বিচার

গ. সৎসঙ্গ

ঘ. অনৈতিকতা

৪. শ্রেয়ার কাজটিতে নৈতিক মূল্যবোধের যে গুণটির প্রকাশ ঘটেছে তা -

i. মনুসংহিতায় বিস্তারিত বলা হয়েছে

ii. অহেতুক কাউকে কষ্ট দেওয়া হতে বিরত রাখে

iii. অপরাধীকে ক্ষমা করে দেয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ.ii ও iii

গ.i ও iii ঘ. i, ii,ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন
দীনেশ বাবুর বড় ছেলে ঢাকায় একটি বেসরকারি সংস্থায় চাকরি করে। ছোট ছেলে বাড়িতেই তার সঙ্গে সংসারের কাজকর্ম তদারক করে। বড় ছেলে অফিসের কাজের ঝামেলায় সহজে বাড়ি যেতে পারে না। তিনি একবার খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। ছোট ছেলে সমীর তাকে হাসপাতাল হতে চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ করে এনে সকল সম্পত্তি তার নামে লিখে দিতে বললেও তিনি তাতে রাজি না হয়ে দুই ছেলেকেই সম্পত্তির সমান

অংশীদার করেন। এতে সমীর তার বাবাকে একাকী ডেকে প্রচন্ড গালাগালি করে। সে তার বাবার কোনো কথা শুনে না। এরপর থেকে সে বিভিন্ন কাজে হেরে যেতে থাকে।

ক. ইন্দ্রিয় নিগ্রহ কাকে বলে?

খ. পাপকে ঘৃণা করো পাপীকে নয়- কোন প্রসংগে বলা হয়েছে তা ব্যাখা করো।

গ. দীনেশ বাবুর কার্যক্রমে নৈতিক মূল্যবোধের যে গুণটি প্রকাশ পেয়েছে তা ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকে সমীরের যে মূল্যবোধের অভাবের কারণে সে হেরে যেতে থাকে তা তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. অহিংসাকে পরম ধর্ম বলা হয় কেন?

২. সাধু ও শ্রীধরের গল্পের মূল বিষয় কী তা ব্যাখ্যা করো।

৩. প্রহ্লাদের গল্পের শিক্ষা কোন মূল্যবোধের অন্তর্ভুক্ত তা বর্ণনা করো।

২০২৬

সমাপ্ত

পরিশিষ্ট

সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণের কয়েকটি নিয়ম:

পূজা, প্রার্থনা বা বিভিন্ন প্রয়োজনে আমাদেরকে সংস্কৃত মন্ত্র পাঠ করতে হয়। কিন্তু সংস্কৃত উচ্চারণ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা না থাকায় মন্ত্রসমূহের উচ্চারণ সঠিক এবং শ্রুতিমধুর হয় না। এমনকি অনেক সময় অর্থেরও বিভ্রাট ঘটে থাকে। এখানে সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণের কিছু সাধারণ নিয়ম বর্ণিত হলো যাতে শিক্ষার্থীরা নির্ভুলভাবে মন্ত্র উচ্চারণ করতে পারে। বর্ণিত নিয়ম অনুসরণ করে পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন মন্ত্রের উচ্চারণ অনুশীলন করা যেতে পারে।

হিন্দুধর্মের ধর্মগ্রন্থসমূহ বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষায় লেখা। বৈদিক ও সংস্কৃত বর্ণমালা এবং বাংলা বর্ণমালার মধ্যে দুই/চারটি বর্ণ ছাড়া অন্যগুলোর উচ্চারণ প্রায় একই রকম। কয়েকটি বাংলা বর্ণ সংস্কৃতে নেই । যেমন, ড়, ঢ়, য় । বাঙালিদের উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য ধরে বিদ্যাসাগর মহাশয় এগুলো সৃষ্টি করেছেন। সংস্কৃতে 'য়' নেই। অন্তস্থ য বর্ণটি ইয় (য়) এরূপে উচ্চারিত হয়। যেমন, যা দেবী= ইয়া দেবী। যদা যদা হি = ইয়দা ইয়দা হি। অন্তস্থ য (য)- ফলাটি ইয় এর মতো উচ্চারিত হয়। যেমন সূর্য = সূর্-ইয়/ ছুরিয়। বরেণ্যম্ = বরেণ্-ইয়ম্ / বরেণিয়ম্। বীর্যবান্= বীর্-ইয়বান্/ বীরিয়বান্ ইত্যাদি।

সংস্কৃতে দুইটি ব। বর্গীয় ব এবং অন্তস্থ ব। কোনটি বর্গীয় ব এবং কোনটি অন্তস্থ ব তা বোঝার জন্য ব্যাকরণজ্ঞান প্রয়োজন। সাধারণত সন্ধিজাত এবং প্রত্যয়জাত ব অন্তস্থ ব হয়। তাছাড়া বরম্, বা, বিনা, বৃথা, বৈ প্রভৃতি অব্যয় পদের ব অন্তস্থ ব হয়। সংস্কৃতে অন্তস্থ ব এর উচ্চারণ ওয়া এর মতো (ইংরেজি W এর মতো । যেমন, Water) । যেমন, স্বাগতম্= স্-ওয়াগতম্/ সোয়াগতম্/ ছোয়াগতম্। বিদ্বান= বিদ্-ওয়ান, সরস্বতী = সরস্-ওয়াতী/ ছরছ্ওয়াতী/ ছরছোয়াতী ইত্যাদি।

সংস্কৃতে স এর উচ্চারণ ছ এর মতো। যেমন, সর্বভূতেষু = ছর্বভূতেষু। সর্বেষাং = ছর্বেষাং। সংস্কৃতে যুক্ত অক্ষরটি যে যে বর্ণ নিয়ে গঠিত তার প্রত্যেকটির উচ্চারণ হয়। যেমন, আত্মা=আত্-মা, গ্রীষ্ম= গ্রীষ্-ম, পদ্মা= পদ্-মা, ব্রহ্ম = ব্রহ্-ম, পরীক্ষা= পরীক্-ষা। সংস্কৃতে বিসর্গ (ঃ) এর উচ্চারণ হ এর মতো। ইংরেজিতে বিসর্গকে h দিয়ে লিখতে হয়। নমঃ= নমহ্, শান্তিঃ= শান্তিহ্, নরাঃ= নরাহ্, সমবেতাঃ= ছমবেতাহ্ ইত্যাদি।

অধিকাংশ সংস্কৃত মন্ত্র বা শ্লোক সন্ধিবদ্ধ পদে লিখিত। তাই সন্ধি জ্ঞান না থাকলে সংস্কৃত মন্ত্র বা শ্লোক উচ্চারণ করা কষ্টসাধ্য। তবে এখানে উচ্চারণসহ কয়েকটি মন্ত্র দেওয়া হলো।

১. ওঁ অপবিত্র: পবিত্রো বা সর্বাবস্থাং গতো'পি বা।
য: স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরে শুচি:।।

[উচ্চারণ - ওম্ অপবিত্রহ পবিত্রো বা ছর্বাবছ্থাং গতো'পি বা। য: স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং ছ বাহ্যাভ্যন্তরে শুচিহ্]

অনুবাদ- পবিত্র বা অপবিত্র যে যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন সে যদি শ্রীবিষ্ণুকে স্মরণ করে তবে তার ভিতর ও বাহির উভয়ই শুচি হয়।

২. ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততম্।। (ঋগ্বেদ, ০১/২২/২০)

[উচ্চারণ- ওম্ তদ্-বিষ্ণোহ্ পরমং পদং ছদা পশ্-ইয়ন্তি ছুরয়হ্। দিবীব চক্-ষুরাততম্।]

অর্থ- আকাশে সর্বতো বিচারী যে চক্ষু যেরূপ দৃষ্টি করে, বিদ্বানেরা বিষ্ণুর পরমপদ সেরূপ দৃষ্টি করেন।

৩. ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতো'হস্মি দিবাকরম্।।

[উচ্চারণ- ওম্ জবাকুছুমছঙ্কাশং কাশিয়পেয়ং মহাদিউতিম্। ধোয়ান্তারিং ছর্বোপাপোঘ্-নং প্রোণতোঅহ্মি দিবাকরম্।]

অর্থ- জবাফুলের ন্যায় বর্ণ, মহাজোতির্ময় তমোনাশক, সর্বপাপবিনাশক, কশ্যপ ঋষির পুত্র সূর্যদেবকে প্রণাম।

৪. ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণঃ
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ।। (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১১/৩৮)

[উচ্চারণ- তোয়ামাদিদেবহ্ পুরুষহ্ পুরাণহ্ তোয়ামছ্ইয় বিশ্বছ্-ইয় পরং নিধানম্। বেত্তাছিয় বেদ্ইয়ঞ্চ পরঞ্চ ধাম তোয়া ততং বিশ্ওয়াম্-অনন্তরূপো।]

২০২৬ শিক্ষাবর্ষ

অষ্টম শ্রেণি : হিন্দুধর্ম শিক্ষা

মন যার সংশয়ী তার বড় কষ্ট।

–শ্রী সারদা দেবী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।